বিদেশী লোককাহিনী

জগমোহন মুখোপাধ্যায়



বিদেশী লোককাহিনী

৪.৪

জগমোহন মুখোপাধ্যায়

১১২৬

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলকাতা ৯

Acc. No.- 14806

প্রথম সংস্করণ : এপ্রিল ১৯৮৭

প্রচ্ছদ : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়
অলংকরণ : বিমল দাস, সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

ISBN 81-7066-077-7

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ফণিভূষণ দেব কর্তৃক
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে প্রকাশিত এবং
আনন্দ প্রেস অ্যাণ্ড পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে
দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক পি ২৪৮ সি আই টি স্কিম নং ৬ এম
কলকাতা ৭০০০৫৪ থেকে মুদ্রিত।

মূল্য : ১০·০০

মা ও বাবার স্মৃতির উদ্দেশে

সূচী



ভূমিকা

বইটি Unesco প্রকাশিত Birthright of man থেকে নির্বাচিত দশটি বিদেশী উপকথার বাংলা অনুবাদের সঙ্কলন। এক বিশ্বভ্রাতৃত্বের মাধ্যমে বিশ্বশান্তি স্থাপনের প্রয়াসে ১৯৪৮ খৃস্টাব্দে রাষ্ট্রপুঞ্জ (United Nations) একটি সার্বজনীন মানবাধিকার বিল (Universal Declaration of Human Rights) প্রণয়ন করে। অধিকারগুলো হল ব্যক্তিস্বাধীনতা, বাক্‌স্বাধীনতা, প্রত্যেক মানুষের

বাঁচার অধিকার, দৈহিক নিরাপত্তার অধিকার, শোষণ ও দাসত্ব থেকে মুক্তি, জাতি ধর্ম বর্ণ, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের সমান অধিকার, আইনের দৃষ্টিতে সমতা, ইত্যাদি। এই মানবাধিকার বিলের কুড়ি বছর পূর্তি উপলক্ষে পৃথিবীর প্রায় সকল দেশের সর্বকালের প্রবাদ, শিলালিপি, ধর্মগ্রন্থ, লোককাহিনী, সাহিত্য ও সংবিধান থেকে প্রাসঙ্গিক অংশগুলি সঙ্কলিত করে Birthright of man বইটি প্রকাশিত হয়েছিল।

বিজ্ঞজনেরা মনে করেন উপকথা কেবলমাত্র অলস তুচ্ছ গল্প নয়। যুগ যুগ ধরে, পৃথিবীর সব দেশের প্রায় সব সমাজেই কিছু না কিছু উপকথা প্রচলিত আছে। উপকথাগুলি নিরক্ষর সমাজে ছিল শিক্ষার মাধ্যম, লৌকিক রীতিনীতি ও মনোভাব সমূহের বিশেষ বাহক ; বর্তমানে মানব ইতিহাসের এক বিশেষ উপাদান। উপরোক্ত দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিচার করলে দেখা যাবে মানুষ যুগ যুগ ধরে তার জন্মগত অধিকারকে কীভাবে দাবী করে আসছে, সঙ্কলিত গল্প দশটি তারই কিছু ইঙ্গিত বহন করে।

বইটির নামকরণ থেকে বোঝা যায় সঙ্কলনটিতে কোন ভারতীয় উপকথা নির্বাচিত করা হয়নি। কারণ, ভারতীয় উপকথা এদেশে সব সময়ই সহজলভ্য। বিদেশী উপকথা বলা হলেও, বইটিতে শেষ পর্যন্ত আফ্রিকা মহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের উপকথাই বেশি স্থান পেয়েছে। গল্পগুলি নির্বাচনে এই সমতার অভাব ইচ্ছাকৃত, বা কোন নীতিগত নয়। কিশোর এবং তদূর্ধ্ব বয়সের পাঠকের উপযুক্ত এবং অনুবাদযোগ্য গল্পগুলি নির্বাচন করতে গিয়ে অনিচ্ছাকৃতভাবেই এই অসমতা ঘটেছে।

গল্পগুলি বাংলায় অনুবাদ করে বই হিসাবে প্রকাশ করার অনুমতি দিয়ে Unesco আমাকে অনুগৃহীত করেছে। এই সামান্য কাজে কিছু সংশ্লিষ্ট তথ্য সংগ্রহে রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচার লাইব্রেরীর কর্মীবৃন্দের অকুণ্ঠ সহযোগিতা পেয়েছি। শ্রীমান গৌতম নিয়োগী অনুবাদগুলি পাণ্ডুলিপি অবস্থায় পড়ে মতামত দান করে অনেক উপকার করেছেন। আমি সকলের কাছেই কৃতজ্ঞ। আমার মত নবীন লেখকের সাহিত্যকর্ম প্রকাশ করার দায়িত্ব নিয়ে আনন্দ পাবলিশার্স আমাকে কৃতজ্ঞতাবদ্ধ করেছেন।

পাঠকবর্গ গল্পগুলি পড়ে আনন্দ পেলেই আমার শ্রম সার্থক হয়েছে মনে করব।



শঠ মার্জার ও বুদ্ধিমান মূষিক

অনেকদিন আগেকার কথা। আফ্রিকার সোমালি রাজ্যে একবার বিড়ালদের খুব দুরবস্থা চলছিল। দিনের পর দিন ইঁদুর ধরে খেতে না পেয়ে তারা যেমন মনোকষ্টে ভুগছিল, তেমনি রোগাও হয়ে যাচ্ছিল। আর ওদিকে ইঁদুরগুলো গাদা গাদা শস্যকণা খেয়ে হয়ে উঠেছিল নধর আর হৃষ্টপুষ্ট।

এইভাবে ইঁদুর না খেয়ে বিড়ালরা আর কতদিন থাকতে পারে! এর একটা বিহিত করতে তারা সব বিড়ালদের এক মিটিং ডাকল—উদ্দেশ্য ছিল সবকটা ইঁদুরকে একসঙ্গে ধরে খাবার একটা ফন্দি আঁটা। মিটিং-এ বিড়ালদের রাজাই সভাপতি হল। সব বিড়াল এসে হাজির হলে, বিড়ালদের রাজা তার পিছনের দু'পায়ে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা শুরু করল, বলল, 'হে মার্জার ভাই ও বোনেরা, তোমরা আমার শুভেচ্ছা গ্রহণ কর। আজ আমরা এখানে কেন এসেছি তোমরা সকলেই জান। ইঁদুরদের বেশ সুদিন চলছে, তাদের খুব

বাড়বাড়ন্ত হয়েছে। ধরা যেন কেবল তাদের দিকেই মুখ তুলে চেয়েছে। তাদের সংখ্যাও যেমন বেড়েছে, গতরও তেমনি হয়েছে নধর। এদিকে আমাদের চলছে দুর্ভিক্ষ,—ইঁদুর না খেতে পেয়ে আমরা দিন দিন রোগা হয়ে যাচ্ছি, আর দুর্বল হয়ে পড়ছি। এখন আমাদের ভেবেচিন্তে এমন এক উপায় বার করতে হবে যাতে করে আমরা ঐ সব ইঁদুরদের সহজে ধরে তাদের সরস মাংস খেয়ে আবার মোটা হতে পারি।' (ইঁদুরের সরস মাংসর কথা শুনে সব বিড়ালের নোলায় নিশ্চয়ই জল এসেছিল, এমন কি রাজামশায়েরও। সে জিবটা একটু চেটে নিয়ে আবার বলতে শুরু করল)। বলল, 'তোমরাই বল এ বিষয়ে কী করে এগনো যায় ?'

তখন এক বৃদ্ধ বিজ্ঞ বিড়াল দাঁড়িয়ে উঠে রাজাকে নমস্কার করে বলল, 'আমাদের রাজামশায় দীর্ঘজীবী হোন। ইঁদুরদের ধরার জন্য আমি একটা উপায় ভেবেছি। বলি কি, আমাদের সঙ্গে শান্তির চুক্তি করার নাম করে কৌশলে সব ইঁদুরদের এক সভায় ডেকে আনা হোক। এমন একটা মাঠে সভা ডাকতে হবে, যেখানে কোন গাছপালা নেই। তাহলেই, ইঁদুররা সভাতে এলে আমরা তাদের অনায়াসে ধরে ফেলতে পারব। তারা আমাদের হাত থেকে পালাতে পারবে না।'

এই বৃদ্ধ বিজ্ঞ বিড়ালের কথা সকলেরই মনঃপূত হল ; সকলেই খুব উৎসাহের সঙ্গে বৃদ্ধ বিড়ালের প্রশংসা করল। তখন বিড়ালদের রাজা আবার বলতে উঠল, বলল, 'হে বৃদ্ধ বিজ্ঞ মার্জার, আপনি দীর্ঘজীবী হোন, আপনার বুদ্ধিও দীর্ঘজীবী হোক। আপনি খুব বিজ্ঞের মতই উপদেশ দিয়েছেন। আমি আজই ইঁদুরদের রাজার কাছে গিয়ে আমাদের এই শান্তি স্থাপনের প্রস্তাব জানাব, এবং যাতে সব ইঁদুররা সভায় আসে তার চেষ্টা করব। হে ভাই ও বোনেরা, তোমরা সেই শুভ সংবাদের জন্য অপেক্ষা কোরো।'

সব বিড়াল তখন জয়ধ্বনি করে উঠল, 'আমাদের রাজা দীর্ঘজীবী হোন।' মিটিং সেখানেই শেষ হল।

সেই কথামত বিড়ালদের রাজা ইঁদুরদের রাজার কাছে গেল। কিন্তু ইঁদুরতো আর বিড়ালদের বিশ্বাস করে না, কাজেই দূরে বসেই দুই রাজার মধ্যে আলাপ আলোচনা চলল।

মার্জাররাজ বলল, 'হে মূষিককুলের অধিপতি, হে স্বাধীনতার প্রতীক, হে জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ, আপনি দীর্ঘজীবী হোন ! আপনার মঙ্গল



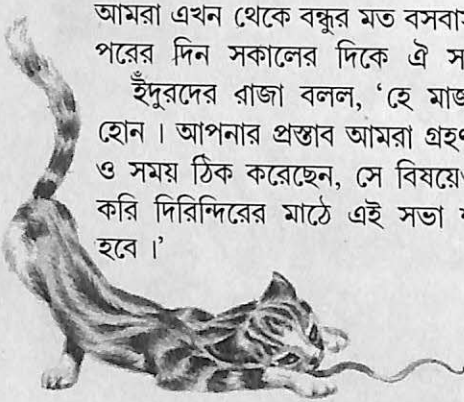
হোক ! আপনার সব কুশল তো ?'

তখন গর্ত থেকে মূষিকরাজ বেরিয়ে এসে বলল, 'হে মার্জারকুলের অধিপতি, আপনি বৃক্ষের মত শীতল ছায়ায় সব কিছু আচ্ছাদিত করে রেখেছেন ! হে পৃথিবীর বিচারকর্তা, হে ত্রাতা, আপনার মঙ্গল হোক ! আপনার সব কুশল তো ?'

দুই রাজার মধ্যে এইভাবে কুশলবার্তা বিনিময়ের পালা শেষ হলে, মার্জাররাজ কোন ভণিতা না করে সোজাসুজি কথাটা পেড়ে বসল, বলল, 'আমি শান্তি স্থাপনের জন্য এসেছি। আমার প্রজাদের পক্ষ থেকে আপনাদের কাছে শান্তির প্রস্তাব এনেছি। আপনি জানেন এই বিড়াল আর ইঁদুরদের মধ্যে যুগ যুগ ধরে শত্রুতা চলে আসছে ; আর তাতে আপনাদেরও ক্ষতি হচ্ছে, আমাদেরও ক্ষতি হচ্ছে। আপনাদের ক্রমাগত মেরে খাওয়ার আমাদের যে বদ অভ্যাস, তাতে আপনাদের

সংখ্যা কমেই চলেছে। আর দেখুন, আপনাদের ধরতে আমাদের কত কষ্ট! তার ওপর ঝোপঝাড়ের মধ্যে আপনাদের পিছনে ছুটে আমাদের চোখে কাঁটা বিঁধে যাচ্ছে। আমরা সবাই প্রায় অন্ধ হয়ে গেছি। সেজন্য আমরা নিজেরাই ঠিক করেছি যে আপনাদের সঙ্গে শান্তি স্থাপন করাই মঙ্গল। দিরিন্দিরের মাঠে সরকারিভাবে আমাদের দু'দলের এক সভা ডাকছি। আমরা সেখানে শান্তির শপথ নেব; আমরা এখন থেকে বন্ধুর মত বসবাস করব। আগামী পূর্ণিমা রাতের পরের দিন সকালের দিকে ঐ সভা বসবে।'

ইঁদুরদের রাজা বলল, 'হে মার্জার-অধিপতি, আপনি দীর্ঘজীবী হোন। আপনার প্রস্তাব আমরা গ্রহণ করলাম। সভার জন্য যে দিন ও সময় ঠিক করেছেন, সে বিষয়েও আমরা একমত হচ্ছি। আশা করি দিরিন্দিরের মাঠে এই সভা শান্তিস্থাপনের সভারূপেই সফল হবে।'



কথাবার্তা শেষ করে মার্জাররাজ যখন অনেকদূর চলে গেল, তখন মূষিকরাজ তার প্রজাদের ডেকে বলল, 'বিড়ালদের রাজা বিড়াল আর ইঁদুরের মধ্যে শান্তি স্থাপনের এক প্রস্তাব নিয়ে আমার সঙ্গে কথা বলতে এসেছিল। আমি সেই প্রস্তাব গ্রহণ করেছি। গাছপালাশূন্য দিরিন্দিরের মাঠে সভা বসবে। আমি কথা যখন দিয়েছি, সে কথা রাখতেই হবে। আর, তোমরাতো জান কথার খেলাপ করা মোটেই সম্মানের কাজ নয়। সুতরাং ঐ সভাতে আমাদের সকলকে যেতেই হবে। তবে কথা হচ্ছে, এতকালের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা এই শিক্ষাই পেয়েছি যে বিড়াল জাতটাকে বিশ্বাস করা যায় না। এখন তোমরাই বল কী করলে সব দিক বজায় থাকে।'

তখন প্রজাদের মধ্য থেকে এক বৃদ্ধ বিজ্ঞ ইঁদুর উঠে বলল, 'আমার একটা মতলব শুনুন—যে দিন সভা বসবে তার আগের দিন দিরিন্দির মাঠে গিয়ে প্রত্যেক ইঁদুর নিজের জন্য একটা গভীর গর্ত খুঁড়ে রাখুক। যাতে বিড়ালরা কিছু সন্দেহ করতে না পারে, সেজন্য গর্তের মাটি মাঠ থেকে বেশ দূরে কোথাও ফেলে আসতে হবে। সভার দিন আমরা যে যার গর্তের ঠিক পাশেই বসে থাকব। বিড়ালের দল যদি শান্তভাবে আসে তাহলে তো কোন কথাই নেই।

কিন্তু আমরা যে বিপদের কথা ভাবছি, অর্থাৎ বিড়ালরা যদি আমাদের ধরতে আসে, আমরা তখনই যে যার গর্তের মধ্যে ঢুকে পড়ব।'

সব ইঁদুর এই উপদেশ মেনে নিয়ে নিজেদের বাসায় ফিরে গেল। বিড়ালদের সঙ্গে সভা বসবার আগের দিন ইঁদুররা দিরিন্দির মাঠে গিয়ে চুপি চুপি যে যার নিজের জন্য একটা গর্ত করে, তার মাটি অনেক দূরে ফেলে দিয়ে এল।



পূর্ণিমা রাতের পর দিন সকালে দিরিন্দির মাঠে সভা। ইঁদুরের দল বেশ আগেই মাঠে এসে যে যার গর্তর পাশে বসে পড়েছিল। একটু বেলাতে বিরাট এক ভোজের আশা নিয়ে বিড়ালের দল আসতে শুরু করল। যখন তারা দিরিন্দির মাঠের বেশ কাছাকাছি এসেছে, বিড়ালদের রাজা তার প্রজাদের মোটামুটি একবার দেখে নিয়ে, তাদের সেখানেই একটু অপেক্ষা করতে বলল ; যাতে ইঁদুরের



দল কিছু সন্দেহ করতে না পারে। তারপর ইঁদুরের রাজাকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'হে মহামান্য মূষিকরাজ, আপনার প্রজারা সবাই এসে গেছেন কি ?'

মূষিকরাজ বলল, 'হ্যাঁ, আমরা সবাই এখানে হাজির। আপনার সব প্রজারা এসেছেন তো ?'

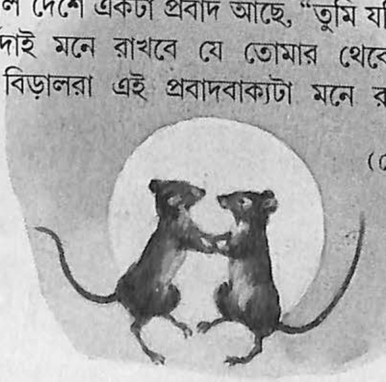
সব ইঁদুর সভায় হাজির এই পাকা খবর নিয়ে বিড়ালের রাজা বলল, 'হে মূষিককুলের অধিপতি, আপনি একটু অপেক্ষা করুন। এই সভার আদবকায়দা সম্বন্ধে আমার প্রজাদের কিছু উপদেশ দিয়ে নি।' এই কথা বলে সে বিড়ালদের আর একবার খুব ভাল করে দেখে নিল—দেখল সকলেই ইঁদুরদের ধরার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। তখন সে আবার ইদুঁরদের দিকে চাইল—সেখানে সব নধর চেহারার ইদুঁরের দল। আর ভোগবিলাসের মধ্যে কাটান মূষিক-রাজের গোলগাল হৃষ্টপুষ্ট চেহারাটা দেখে পর্যন্ত মার্জার-রাজ ঠিক করে রেখেছিল যে তাকে সে নিজেই ধরে খাবে। যখন সে দেখল সব প্রস্তুত, সে বিড়ালদের ভাষায় এক রণ-হুঙ্কার ছাড়ল, বলল, 'ধর সব ইঁদুরগুলোকে, একটাও না পালাতে পারে।'

ইঁদুরদের রাজা যখন দেখল যে বিড়ালের দল তাদের ধরতে আসছে, সে তার পিছনের ছোট ছোট দুটো পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে তার প্রজাদের বলল, 'ভাইগণ, গর্তে ঢুকে পড়, মুহূর্তমাত্রও দেরী করো না।' এই কথা বলে মূষিকরাজ নিজেও গর্তর মধ্যে ঢুকে পড়ল। বিড়ালরা এসে পৌঁছবার আগেই দিরিন্দিরের মাঠ ফাঁকা হয়ে গেল, একটা ইঁদুরের চিহ্ন পর্যন্ত রইল না।

সে দিন যে বিড়ালদের শুধু রসাল ভুরিভোজটাই মাঠে মারা গেল, তা নয় ; তার থেকে খারাপ ব্যাপার হল—ইঁদুরদের কাছে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের অপমানটাই বিড়ালদের ভীষণ মনোকষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়াল।

সোমালি দেশে একটা প্রবাদ আছে, "তুমি যদি নিজেকে খুব চতুর ভাব, সর্বদাই মনে রাখবে যে তোমার থেকেও চতুর পৃথিবীতে আছে।" বিড়ালরা এই প্রবাদবাক্যটা মনে রাখেনি।

(সোমালি দেশের উপকথা)





লম্বকর্ণ রাক্ষসী

অনেক অনেকদিন আগেকার কথা। আফ্রিকার সোমালিদের দেশে হারগেগা নদীর পাশের বনে ধেগধীর নামে এক মানুষখেকো রাক্ষসী বাস করত। সেই রাক্ষসীর খুব লম্বা একটা কান ছিল। সেজন্য তাকে সবাই লম্বকর্ণ রাক্ষসী বলেই জানত। এই কানটাই ছিল তার সর্বস্ব—যতক্ষণ সে জেগে থাকত, কানটা খাড়া হয়ে থাকত ; সে ঘুমিয়ে পড়লে কানটা ধীরে ধীরে নরম হয়ে ঝুলে পড়ত। তখন রাক্ষসীটা কিছু শুনতেও পেত না, বুঝতেও পারত না, তখন সে তার নাকে কিছু গন্ধও পেত না। কিন্তু ঘুম ভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গেই কানটা সোজা খাড়া হয়ে উঠত। লম্বকর্ণ না করত স্নান, না আঁচড়াত মাথা। তার হাতে পায়ে কুড়িটা আঙ্গুলের বড় বড় নখগুলো দেখে মনে হত যেন সিংহের থাবা। ভুরু দুটো ছিল যেমন বড়, তেমনি লোমে ভর্তি। দাঁতগুলো ছিল ক্ষুরের মত ধারাল ; আর ছিল আগুনের গোলার মত বড় বড় লাল লাল চোখ। তার পোশাকের

মধ্যে থাকত কোমরে নোংরা একটা ঘাগরা ; সারা গায়ে পোশাক বলতে আর কিছুই থাকত না। সব মিলিয়ে সে এক কুৎসিত ভয়ঙ্কর চেহারা !

কিন্তু এই রাক্ষসীর একটা যে মেয়ে ছিল, সে ছিল বেশ সুন্দরী। তার ব্যবহারও ছিল যেমন মিষ্টি, তেমনি ভালো। দেখতে ছিল লম্বা ফর্সা, গড়নটাও সুন্দর। লম্বকর্ণ যখন শিকার করতে যেত, এই ছোট রাক্ষসী রান্না করত আর বাড়ি পাহারা দিত। লম্বকর্ণ সারাদিন শিকার করে, রাতে সেই সব শিকার নিয়ে বাড়ি ফিরত।

লম্বকর্ণ রাক্ষসীর বাড়িতে নানা রকমের খাবার রাখার জন্য অদ্ভুত ধরনের অনেকগুলো হাঁড়ি ছিল—একটাতে থাকত জল, একটাতে থাকত তার শিকার করা মানুষের রক্ত, আর একটাতে মানুষের মাংস। যে হাঁড়িটাতে মানুষের মাংস রাখা হত, তার নাম ছিল বা-ধীর। লম্বকর্ণ রাক্ষসী ছাড়া অন্য কেউ হাঁড়িটা খুললেই, সেই



হাঁড়ি বা-ওয়া-ওয়া-ওয়া-ওয়া-ওয়া-ওয়া করে এক বিকট শব্দ করতে থাকত। লম্বকর্ণ রাক্ষসী যতদূরেই থাক, বা-ধীরের ডাক তার কানে পৌঁছবেই। সেই ডাক কানে গেলেই লম্বকর্ণ ছুটতে ছুটতে বাড়ির দিকে আসত, আর চেঁচাত, 'কোন হতভাগা আমার বা-ধীর খুলেছে? কোন হতভাগা আমার বা-ধীর খুলেছে?'

লম্বকর্ণ রাক্ষসীটা খুব জোরে দৌড়তে পারত; আর কোন মানুষের ওপর একবার নজর পড়লে তাকে সে ছুটে গিয়ে ধরবেই। তার প্রিয় খাবার ছিল নধর কচি ছেলে-মেয়েদের নরম নরম মাংস। পৃথিবীতে সে শুধু একটা জিনিসকেই ভয় করত—সেটা হচ্ছে হারগেগা নদীর তীর, আর তার খাদ।

একদিন সে দেখল একটা মেয়ে বেশ নধর একটা কচি ছেলেকে কোলে নিয়ে যাচ্ছে। সেও তাদের পিছু নিল। তাদের পিছনে ছুটতে ছুটতে সে দাঁত কিড়মিড় করে বলছিল, 'মেয়েটা কী মোটাসোটা! আর বাচ্চাটাও কী গোলগাল নাদুসনুদুস! ওদের দুটোকে ধরতেই হবে। কী মিষ্টিই না খেতে হবে ওদের মাংস! ঐ হতভাগা হারগেগা নদীটার কাছে পৌঁছবার আগেই ওদের ধরে ফেলতে হবে।'

কিন্তু বরাতক্রমে সেই মেয়েটা এই বনের হালচাল জানত। যেই



বুঝেছে যে লম্বকর্ণ রাক্ষসী তাদের ধরতে আসছে, সেও সোজা হারগেগা নদীর খাদের দিকে ছুট দিল ; তারপর লম্বকর্ণ রাক্ষসী পৌঁছবার আগেই নদী পার হয়ে পালিয়ে গেল । এমন নধর শিকার হাতছাড়া হয়ে যেতে রাক্ষসীটা রেগে অনেকক্ষণ ধরে নিজের গায়েই বালি ছুঁড়ল । বড় বড় নখ দিয়ে নিজের শরীর খামচাল ; তারপর পা ছড়িয়ে বসে নিজের মাথার চুল ছিড়তে লাগল ।

একদিন বিকেলের দিকে, ছোট রাক্ষসী যখন রান্না করছিল আর সেই সঙ্গে বাড়ি পাহারা দিচ্ছিল, দুটো ফুটফুটে সুন্দরী মেয়ে লম্বকর্ণর বাড়ির সামনে এসে হাজির হল । মেয়ে দুটো শ্রান্ত ক্লান্ত হলেও, দেখতে বেশ মিষ্টি লাগছিল । আর তারা ছিল ছোট রাক্ষসীর প্রায় সমবয়সী ।

মেয়ে দুটোকে দেখে ছোট রাক্ষসী দোটানায় পড়ল । একদিকে মেয়ে দুটোর গায়ের নরম নরম মাংস দেখে তার রাক্ষসী স্বভাবটা কানায় কানায় জেগে উঠল ; যেন সে তাদের রক্ত আর মাংসর গন্ধ পেতে লাগল । অন্যদিকে তার মন খুশিতে ভরে উঠল,—তারই সমবয়সী মেয়েদুটোকে দেখে ভাবল, এত দিনে যেন সে গল্প করার মত সঙ্গী পেয়ে গেল ।

সামনাসামনি হতে তারা অবাক হয়ে পরস্পরের দিকে চেয়ে রইল—তারা চোখ কান নাক সব দিয়েই যেন পরস্পরকে জানতে চেষ্টা করছিল । এইভাবে কিছুক্ষণ থাকার পর বড় মেয়েটা প্রথম মুখ খুলল ; সে ছোট রাক্ষসীকে বলল, 'বোন, আমাদের খুব তেষ্টা পেয়েছে, তাড়াতাড়ি একটু জল দাও ।'

ছোট রাক্ষসী ঘরে গিয়ে একটা কিম্ভূতকিমাকার বড় জালা থেকে নোংরা জগে করে জল এনে তাদের দিল । যখন মেয়ে দুটো জল খাচ্ছিল, ছোট রাক্ষসী ঘরে গিয়ে বড় বড় দু টুকরো চর্বিতে ভরা সদ্য ঝলসানো মাংস এনে তাদের খেতে দিল । প্রায় দুদিন অনাহারে থাকার পর মেয়ে দুটো সেই মাংস পেয়ে খিদের চোটে গপগপ করে খেতে লাগল । ছোট রাক্ষসী বেশ স্নেহভরে তার এই অতিথিদের খাওয়া দেখছিল ; এইতো প্রথম এক মানুষখেকো রাক্ষসী তাদেরই খাদ্য মানুষকে দয়া দেখাল ।

মেয়ে দুটো মনে করেছিল তারা খুব ভাল পাঁঠার মাংস খাচ্ছে । খাওয়া শেষ করে তারা ছোট রাক্ষসীকে অনেক ধন্যবাদ দিল, আর

মন খুলে আশীর্বাদও করল।

ছোট রাক্ষসী তখন প্রশ্ন করল, 'তোমরা কে ভাই ? কোথা থেকে এসেছ ? কী জন্যেই বা এখানে এসেছ ?'

মেয়ে দুটো বলল, 'আমরা বনে পথ হারিয়ে ফেলেছি। আমাদের মা নেই, বাবা খুব গরীব। আমরা এগার বোন, একটাও ভাই নেই। গতকাল বাবা আমাদের এই বনের ধারে নিয়ে এসে বনের মধ্যে বুনো বাদাম কুড়োতে পাঠাল, আর নিজে মোট বোঝাই উটটা পাহারা দিতে বসল। আমাদের বলল, "এই উটের ঘন্টা শুনবি, আর বেলা পড়ে এলেই এখানে ফিরে আসবি।" বাদাম কুড়িয়ে ফিরে এসে দেখি উটের গলার ঘন্টা গাছে ঝোলান, বাতাসে দুলে দুলে সেটা বেজে





চলেছে। কিন্তু সেখানে বাবাও নেই, উটও নেই। বাবা আমাদের ফেলে চলে গেল। বাবাকে কত খুঁজলাম, কিন্তু কোথাও পেলাম না। রাতে বনের মধ্যেই ঘুমিয়েছি ; এক কণা খাবার পর্যন্ত জোটেনি। বনে ঘুরতে ঘুরতে পথ হারিয়ে ফেলেছি। এখানে এসে তোমাদের বাড়িটা পেয়ে মনে হল যেন বাঁচলাম।'

ছোট রাক্ষসী খুব মন দিয়ে এই সব কথা শুনছিল। মেয়ে দুটো নিজেদের কথা শেষ করে তাকে বলল, 'এবার তুমি তোমার মা-বাবার কথা বল।'

এ কথার কোন উত্তর না দিয়ে ছোট রাক্ষসী কাঁদতে শুরু করল, বলল, 'আমার মা রাক্ষসী, মানুষ খায়। বাড়ি ফিরে তোমাদের দেখতে পেলেই মেরে খেয়ে ফেলবে। কী হবে ভাই!' ছোট রাক্ষসীর মুখটা ভয়ে যেন শুকিয়ে গেল।

মেয়ে দুটো বুঝতেই পারেনি যে তারা এক মানুষখেকো রাক্ষসীর বাড়িতে এসে পড়েছে। ঘরের মধ্যে নানা ধরনের হাঁড়িগুলো দেখে

তারা কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'এগুলো কি ?' তখন ছোট রাক্ষসী তাদের বুঝিয়ে দিল, 'এটা জল রাখার জালা, আর ঐ যে হাঁড়িটা দেখছ, ওটা বা-ধীর, ওটাতে মানুষের ভাল ভাল মাংস রাখা আছে। আর তার পরের হাঁড়িটাতে আছে মানুষের রক্ত—'

মেয়ে দুটো ছোট রাক্ষসীকে আর বলতে না দিয়ে আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করল, 'মানুষের রক্ত ? মানুষের মাংস ? এ সব হয় কী ?'

'আমরা খাই, আমার মা আর আমি,' খুব সহজ ভাবেই ছোট রাক্ষসী উত্তর দিল।

'তোমরা খাবার জন্য এখানে অন্য কিছু পাও না ?' মেয়ে দুটো প্রশ্ন করল।

'আর কী খাব ?'

'কেন ? জন্তু-জানোয়ারের মাংস, তাদের দুধ।'

'তোমরা ওসব খাও বুঝি ?' আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করল ছোট রাক্ষসী।

'তোমরা খেয়ে দেখো, খুব ভাল লাগবে,' মেয়ে দুটো বলল।

'তোমাদের এখন যা খেতে দিয়েছিলাম ঐ রকমই খেতে ?'

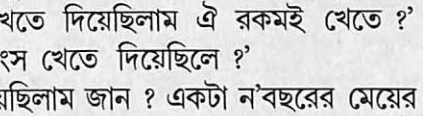
'আমাদের ত পাঁঠার মাংস খেতে দিয়েছিলে ?'

'না। তোমাদের কী দিয়েছিলাম জান ? একটা ন'বছরের মেয়ের বুকের আর দাবনার মাংস।'

এই কথা শুনেই মেয়ে দুটো বমি করতে শুরু করল। ছোট রাক্ষসীতো এই সব দেখে খুব আশ্চর্য হয়ে গেল, কিছুটা বিব্রতও বোধ করতে লাগল। তখন বেশ কুণ্ঠার সঙ্গে বলল, 'মানুষের মাংস মানুষকে খেতে নেই বুঝি ?'

মেয়ে দুটো বলল, 'বোন, মানুষের মাংস খাওয়া অতি নীচ কাজ।'

ছোট রাক্ষসী তখন খুব লজ্জা পেয়ে গেল, বলল, 'আমি তো একথা জানতাম না।'



কিছুক্ষণ বাদে লম্বকর্ণ রাক্ষসীর ফিরে আসার শব্দ শোনা গেল। ছোট রাক্ষসী তাড়াতাড়ি মেয়ে দুটোকে বাড়ির চোরা কুঠরিতে লুকিয়ে রাখল। লম্বকর্ণ একটা বছর দশেক বয়সের ছেলে শিকার করে নিয়ে এসেছিল ; বাড়িতে বসে সেটাকে খেয়ে ফেলল। চোরা

কুঠরি থেকে মেয়ে দুটো সেই বীভৎস দৃশ্য সবটাই দেখেছিল। লম্বকর্ণ খাওয়া শেষ করে আবার শিকারে চলে গেল। তখন মেয়ে দুটো চোরা কুঠরি থেকে বেরিয়ে এসে ছোট রাক্ষসীকে বলল, 'তোমার মায়ের কি দয়ামায়া বলে একটুও কিছু নেই ? অমন ফুটফুটে সুন্দর ছেলেটাকে মেরে খেয়ে ফেলল ! কী ভয়ঙ্কর দৃশ্য ! চল, আমরা পালাই। তুমি যাবে আমাদের সঙ্গে ? কোন কষ্ট হবে না তোমার।'

ছোট রাক্ষসী বলল, 'আমরা কী করে পালাব, ভাই ? মা খুব জোরে ছুটতে পারে। চোখের নিমেষে আমাদের ধরে ফেলবে। তার ঘ্রাণশক্তিও খুব, আর মাটিতে পায়ের ছাপ দেখে আমরা কোন পথে গেছি ঠিক জানতে পারবে। আমরা যত জোরেই ছুটি না কেন, মা আমাদের ঠিক খুঁজে পেয়ে যাবে। তা ছাড়া আমাদের সঙ্গে খাবারও তো কিছু নিতে হবে। নাঃ, মা না মরা পর্যন্ত আমাদের বাঁচার কোন পথ দেখছি না—'

একটু থেমে ছোট রাক্ষসী আবার বলতে শুরু করল, 'তোমরা যদি আমাকে সাহায্য কর, আজ রাত্তিরেই মাকে মেরে ফেলব। মা-টা খুব খারাপ। মাকে আমার খুব ভয় করে। আমি কতবার বলেছি, তুমি যে সব ছেলেমেয়ে ধরে আন, একটা অন্তত না মেরে আমাকে দাও, আমার সঙ্গে খেলা করবে। কিন্তু কখনও দেয়নি। যাদের ধরে নিয়ে আসে তাদের অনেককেই বেশ সুন্দর দেখতে, আমি তাদের খুব ভালবাসতে পারি। নাঃ, মা খুব খারাপ। এসো, আমরা আজ রাত্তিরেই মাকে খুন করে ফেলি। তারপর আমরা কিছু খাবার সঙ্গে নিয়ে যেখানে খুশি চলে যেতে পারব। আমরা ত তখন স্বাধীন, কেউ ধরবার ভয়ও থাকবে না। মা এবার ক্লান্ত হয়ে ফিরে এসে কিছু খেয়েই শুয়ে ঘুমিয়ে পড়বে। তার খাড়া কানটা যখন নুয়ে পড়বে তখন সে কিছু শুনতেও পাবে না, কি হচ্ছে না হচ্ছে বুঝতেও পারবে না। সেই সুযোগে আমরা ঐ বড় উননটা জ্বেলে গোটাকতক লোহার সিক তার মধ্যে গুঁজে দেব। সিকগুলো তেতে লাল হয়ে উঠলে, আমাদের একজন মার কানটা চেপে ধরব, যাতে ওটা খাড়া না হয় ; তখন আর দুজন মাকে ঐ গরম সিকগুলো দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মেরে ফেলব। তারপর থেকে ত আমরা স্বাধীন, আমরা মুক্ত। তখন আমরা খুব খেলা করব।'

একটু পরেই লম্বকর্ণ রাক্ষুসীটা ফিরে এল। এবার শিকার করে আনল একটা পনের বছরের মেয়ে। তাকে মেরে ফেলে রাক্ষসী তার



Acc. No. - 14806

রক্তটা খেয়ে যেন একটা আরামের নিশ্বাস ফেলল ; বলল 'আঃ, গরম গরম, আর কী মিষ্টিই না খেতে !' তারপর যে গেলাসটা করে রক্ত খাচ্ছিল, সেটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। তার লম্বা কানটাও ধীরে ধীরে নুয়ে পড়ল।

লম্বকর্ণকে ঘুমিয়ে পড়তে দেখেই ছোট রাক্ষসী চোরা কুঠরি থেকে মেয়ে দুটোকে বার করে নিয়ে এল। তিনজনে মিলে তখন সেই বড় উননটা জ্বেলে তার মধ্যে চারটে বেশ মোটা মোটা লোহার সিক গুঁজে দিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সিকগুলো তেতে লাল হয়ে উঠল। তখন তাদের একজন সেই মানুষখেকো রাক্ষসীর লম্বা কানটা মুঠো করে ধরে মুচড়ে ভেঙ্গে দিল, আর বাকী দুজনে গরম-আগুন লোহার সিকগুলো দিয়ে খোঁচা মেরে লম্বকর্ণকে মারতে শুরু করল। রাক্ষসীটার তখন কী ভীষণ চীৎকার ! সে ভেবেছিল হয়ত কোন অচেনা লোক তাকে পুড়িয়ে মারছে। সে তখন তাকে উদ্দেশ করে খুব গালাগালি দিচ্ছিল। তারপর ধীরে ধীরে তার চেঁচানি কমে আসতে লাগল। শেষে মরে গেল।

মানুষখেকো রাক্ষসীটাকে মেরে ফেলে মেয়ে তিনটে বাইরে বেরিয়ে এসে দেখল খুব বৃষ্টি পড়ছে। যতদিন লম্বকর্ণ রাক্ষসীটা বেঁচেছিল সে দেশে বৃষ্টির নামগন্ধ ছিল না। এখন বৃষ্টি পড়ছে দেখে মেয়ে তিনটের আনন্দ আর ধরে না। সেদিন যখন আকাশে মেঘ ডাকছিল, আর ঝম্‌ঝম্‌ করে বৃষ্টি পড়ছিল, ছোট রাক্ষসীও সেই মেয়ে দুটোর সঙ্গে নাচতে নাচতে গান গাইতে লাগল :

লম্বকর্ণ মরেছে—
দেশে শান্তি ফিরেছে,
জিগজিগাতে বৃষ্টি নেমেছে।
লম্বকর্ণ মরেছে—।

(সোমালি জাতের প্রচলিত কাহিনী)



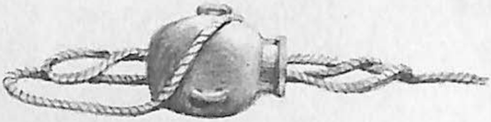


সত্যনিষ্ঠ বিগ্ ক্লাব

আফ্রিকার বুরুণ্ডি রাজ্যে এক গরিব লোক বাস করত। এমনিই তার দুর্ভাগ্য—তার যে একটা মাত্র ছেলে ছিল, সেও বিকলাঙ্গ। ছেলেটার হাত আর পা দুটো যেন পেটের সঙ্গে জোড়া। লোকে তার নাম রেখেছিল 'বিগ্ ক্লাব'। ক্রমে যখন সে বড় হয়ে উঠল, সবাই তাকে দেখে ভয়ে আঁতকে উঠত। ছেলেটা এই সব দেখে লজ্জায় ও মনের দুঃখে গ্রাম ছেড়ে গভীর বনে পালিয়ে গেল। সেখানে সে একাই থাকত। আর জন্তুজানোয়ার শিকার করে কোন রকমে জীবনধারণ করত।

বিগ্ ক্লাব বিকলাঙ্গ হলেও, সে ছিল বেশ বুদ্ধিমান। একদিন শিকার করতে করতে সে একেবারে একটা বুনো মোষের সামনে এসে পড়ল। বুনো মোষটা শিং বাগিয়ে তাকে মারতে এল, কিন্তু বিগ্ ক্লাব মিষ্টি কথা বলে তাকে ঠাণ্ডা করল। তারপর বলল, 'দেখ, আমাকে মেরে ফেলো না। বরং এসো, আমরা দুজনে বন্ধু পাতিয়ে শান্তিতে

বসবাস করি। তুমি আমাকে একটা হরিণ মেরে এনে দাও ; আর আমি তোমাকে বিপদ–আপদ থেকে বাঁচাব। বুনো মোষটা এই প্রস্তাবে রাজী হয়ে গেল।



তারপর এক সময় এই বুরুণ্ডিতে খুব খরা হয়েছিল। পুকুর নদী সব শুকিয়ে গেল। একদিন সেখানকার গ্রামের লোকেরা জলের সন্ধানে সেই বনের মধ্যে এসে পড়ল। সেখানে বিকলাঙ্গ বিগ্ ক্লাবকে দেখে বলল, 'এটা একটা দৈত্য। এর জন্যই বৃষ্টি নামছে না। এই অলুক্ষণে ছেলেটাই আমাদের দেশে দুর্দিন এনেছে। এসো, আমরা ওকে মেরে ফেলি।'

বিগ্ ক্লাব তখন হাতজোড় করে প্রাণ ভিক্ষা চাইল। আর তাদের কাছে প্রতিজ্ঞা করল যে সে টাঙ্গানাইকা হ্রদ থেকে জল এনে তাদের দেবে। বিগ্ ক্লাব তার কথা রাখতে পারে কিনা দেখার জন্য সেই গ্রামের লোকগুলো তাকে প্রাণে মারল না। সেও তখন ধীরে ধীরে টাঙ্গানাইকা হ্রদের দিকে রওনা হয়ে গেল।

কিছু দূর যেতে না যেতেই তার বন্ধু সেই বুনো মোষটার সঙ্গে দেখা। মোষটাও জলের সন্ধানে ঘুরছিল।সে বিগ্ ক্লাবকে দেখতে পেয়ে বলল, 'কি বন্ধু, তোমার সেই প্রতিজ্ঞার কথা মনে আছে তো? আমি এখন জল চাই।'

বিগ্ ক্লাব বলল, 'আমাকে মেরে ফেলো না ভাই। আমি টাঙ্গানাইকা হ্রদ থেকে জল আনতে যাচ্ছি। জল এনে তোমাকেও দেব।'

বুনো মোষটা বলল, 'তুমি মিথ্যে কথা বলছ। তার থেকে বরং তোমাকে মেরে খেয়ে ফেলা ভাল। আমি তেষ্টায় মরে যাবার আগে তোমাকে মেরে খেয়ে ফেললে তুমি অন্তত আমার একটা ভাল কাজে লেগে যাবে। আমার বিশ্বাসই হয় না তুমি এতটা পথ জল বয়ে আনতে পারবে। তাছাড়া, পথে কত বুনো জন্তুজানোয়ার রয়েছে। তারা তো তোমাকে খেয়েই ফেলবে।'

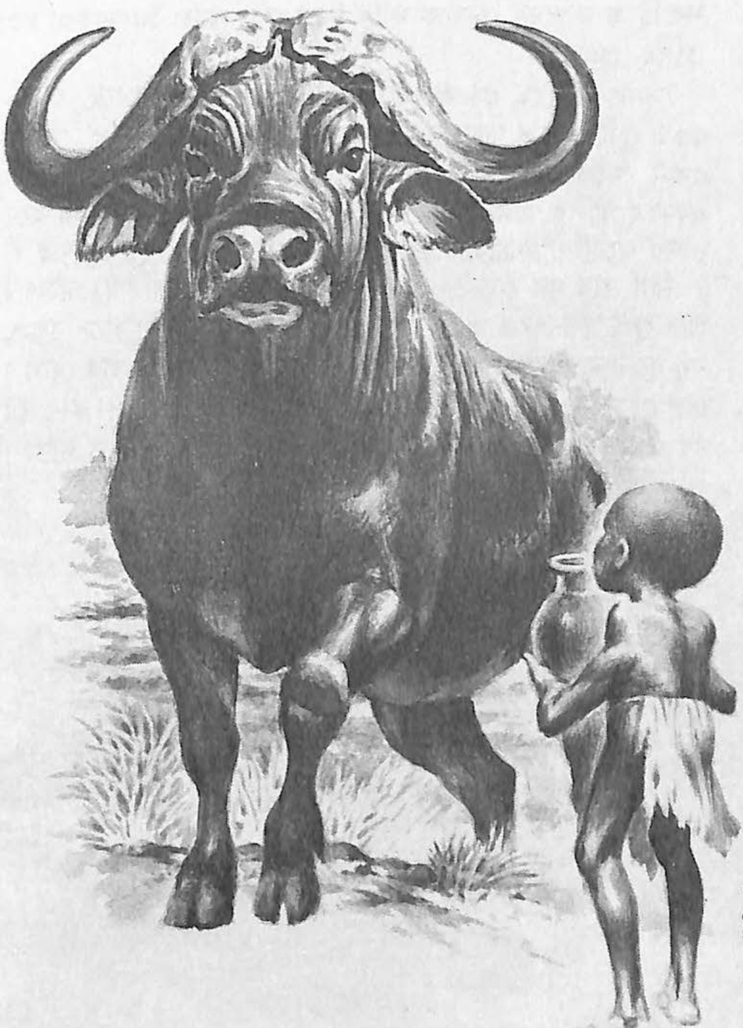
বিগ্ ক্লাব তখন অনেক অনুনয়-বিনয় করতে বুনো মোষটা শেষ পর্যন্ত তাকে প্রাণে মারল না, ছেড়ে দিল।

সেখান থেকে কিছুটা পথ গিয়েই বিগ্ ক্লাব দেখল একটা সিংহ

সারা রাস্তা জুড়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। পশুরাজ তাকে দেখে বলল, 'তারপর ! কোথায় যাওয়া হচ্ছে ? জানিস্, আমি এই বনের রাজা ; আর তুই যখন নিজেই আমার সামনে এসেছিস্, আয় তোকে খাই।'

বিগ্ ক্লাব বলল, 'মশাই, আপনি আমাকে ছেড়ে দিন। আমি টাঙ্গানাইকা হ্রদ থেকে জল আনতে যাচ্ছি। ফেরার পথে আপনার আহারের জন্য একটা বড় জানোয়ার দিয়ে যাব।'

পশুরাজ বলল, 'তুই আমাকে বোকা পেয়েছিস ? তুই বড় জানোয়ার ধরে আনবি কী করে ? তাছাড়া, ঐ হ্রদের যে মালিক



একটা কুমীর আছে, তার কাছ থেকে তুই জল নিতেই পারবি না। আর সেই কুমীরই তোকে খেয়ে ফেলবে। বরং তুই আয়, তার আগে আমি তোকে খেয়ে নি।'

শেষে যখন বিগ্ ক্লাব অনেক করে বলল যে সে তার জন্য জল আর একটা বড়সড় জানোয়ার নিশ্চয়ই নিয়ে আসবে, তখন সিংহ তাকে যেতে দিল।

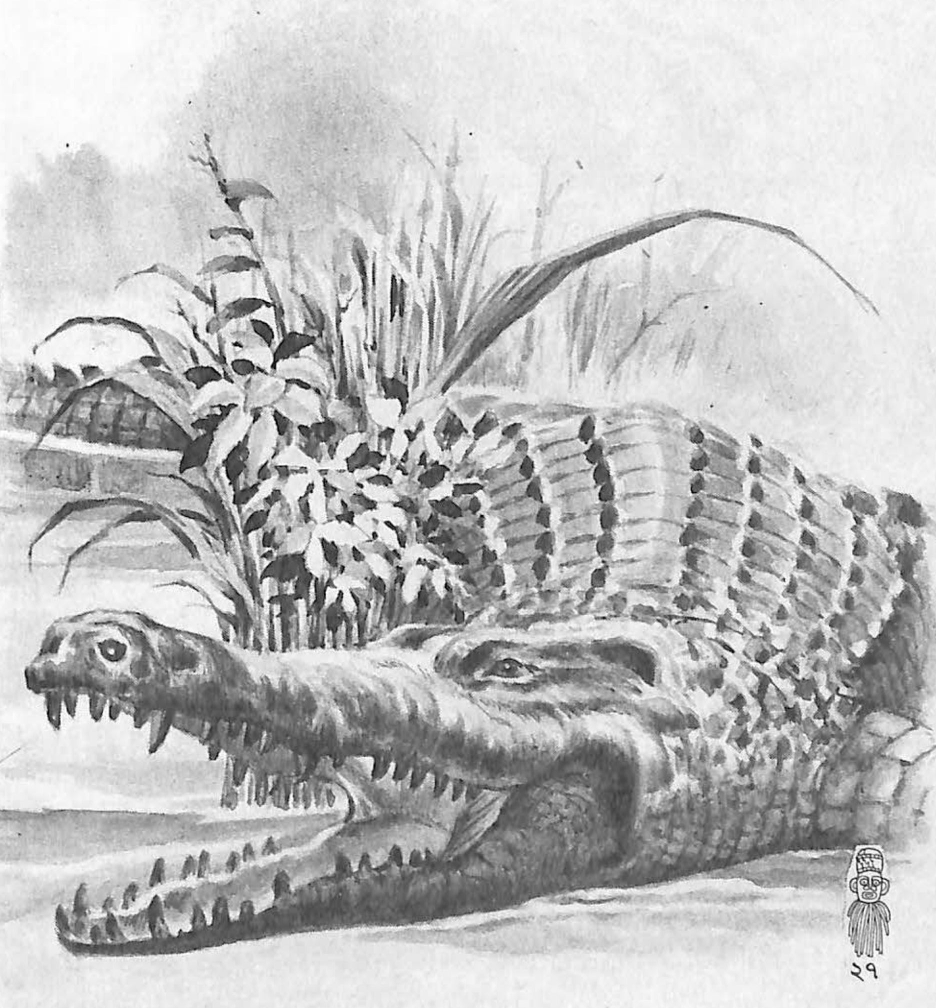
দুঃসাহসী বিগ্ ক্লাব আবার চলতে শুরু করল। যেতে যেতে সে একগাছা বেশ মোটা আর শক্ত দড়ি পাকিয়ে নিল ; আর পথে অন্য সব হিংস্র জন্তুদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে শেষ পর্যন্ত টাঙ্গানাইকা হ্রদে পৌঁছে গেল।

সেখানে পৌঁছে সে সবেমাত্র জল তুলতে শুরু করেছে, অমনি একটা কুমীর এসে তার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ল ; বলল, 'কে তোকে এখান থেকে জল নেবার হুকুম দিয়েছে রে ? জানিস, এখানকার একমাত্র মালিক হচ্ছি আমি। যাক্, তুই আমার সামনে হাজির হয়ে ভালই করেছিস্। আমার খুব খিদে পেয়েছে। আয়, তোকে খাই।'

বিগ্ ক্লাব খুব অনুনয়ের সুরে কুমীরের কাছে প্রাণভিক্ষা চাইল। আর সেই হ্রদ থেকে জল নেবার অনুমতি প্রার্থনা করল। সে বলল, এর নজরানা হিসেবে কুমীরকে একটা মোটাসোটা জানোয়ার দেবে। জল থেকে উঠে সে কুমীরকে বলল, 'শুনুন, আমি হচ্ছি বিগ্ ক্লাব, যে সব সময় সত্য কথা বলে ; আর কোন কথা দিলে, সেটা রাখে।



আপনি দড়ির এইদিকটা ধরে থাকুন। দড়িতে টান পড়লেই বুঝবেন দড়ির অন্যদিকে আপনার জন্য সেই মোটাসোটা জানোয়ারটা বেঁধে দিয়েছি। আপনি তখন প্রাণপণে দড়িটা টেনে যাবেন, যতক্ষণ না জানোয়ারটা আপনার কাছে এসে হাজির হয়। কুমীর খুব খুশি হয়ে বিগ্ ক্লাবকে অনেক ধন্যবাদ দিয়ে ছেড়ে ছিল ; আর নিজে বিরাট এক ভোজের আশায় দড়িটা মুখে ধরে পড়ে রইল।





এদিকে সেই সিংহটা তো বিগ্ ক্লাবের আসার পথ চেয়ে বসেছিল। বিগ্ ক্লাব তার কাছে পৌঁছেই বলল, 'দেখুন, আমি সেই হ্রদ থেকে জল আনতে পেরেছি কিনা।'

সিংহ বলল, 'সে-তো না হয় খুব সুখের কথাই হল। কিন্তু আমার জানোয়ার কোথায় ?'

বিগ্ ক্লাব বলল, 'তার জন্য ভাবছেন কেন ! এই দড়িটা ধরুন।

দড়ির ওদিকটায় জানোয়ার বেঁধে রেখে এসেছি। আপনি দড়িটা ধরে টানতে থাকুন, গায়ের জোরে টেনে যাবেন, যতক্ষণ না জানোয়ারটা আপনার কাছে আসে।' এই বলে বিগ্ ক্লাব চলে গেল।

সিংহ দড়িটা টানতে আরম্ভ করল। দড়ির টানাটানিতে সে বুঝতে পারল সত্যিই ওদিকে বড়সড় একটা জানোয়ার বাঁধা আছে। সে তখন গায়ের সব জোর দিয়ে দড়িটা টানতে শুরু করল ; আর মনে মনে বলল, 'নাঃ, বিগ্ ক্লাব তাহলে আমাকে ঠকায়নি দেখছি !' সিংহ দড়িটা যতই টানছিল, তার মনে হচ্ছিল দড়িটা তাকেও যেন টেনে নিয়ে যাচ্ছে। আসলে দড়ির অন্য দিকটা তো কুমীর ধরেছিল। সিংহ এদিক থেকে দড়িটা টানতেই সে ভাবল বিগ্ ক্লাব তার জন্য জানোয়ার বেঁধে দিয়েছে। কাজেই সেও গায়ের জোরে দড়িটা টানতে আরম্ভ করেছিল। দড়ির একদিকে সিংহ, অন্যদিকে কুমীর—দুই পালোয়ান জানোয়ার নিজেদের মধ্যে দড়ি টানাটানি করতে করতে যখন সামনাসামনি হল, তখন আর কেউ কাউকে খাবার সময় পেল না। নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ করে দুজনেই মরে গেল।

ইতিমধ্যে বিগ্ ক্লাব জল নিয়ে এসে প্রথমে তার বন্ধু বুনো মোষটাকে, পরে গ্রামের সব লোকগুলোকে দিল। সেই জল খেয়ে তাদের তৃষ্ণা মেটার সঙ্গে সঙ্গে সারা দেশে বৃষ্টি নামল। নদী নালা খাল বিল জলে ভরে গেল। মানুষ, জন্তুজানোয়ার, সকলেরই আর জলের অভাব রইল না। দেশে খরা শেষ হয়ে অবস্থা ভালর দিকে ফিরল। লোকেরা তখন বিগ্ ক্লাবকে ঘৃণা ও অবজ্ঞা করে বনে নির্বাসন দেওয়ার জন্য দুঃখ পেল। তাকে একদিন মেরে ফেলার ষড়যন্ত্র করার জন্য সব লোকগুলোর লজ্জাও হল। তারা বিগ্ ক্লাবকে গ্রামে ফিরিয়ে নিয়ে এল। তার থাকার জন্য এক বিরাট প্রাসাদ তৈরি হল। তাকে সবাই নিজেদের রাজা বলে ঘোষণা করল। আর তার বিয়ে দিয়ে একটা রানীও এনে দিল। বিগ্ ক্লাবকে দৈত্য দৈত্য দেখালেও, সে সত্যকথা বলত, আর প্রতিজ্ঞা পালন করত বলে সব লোকের তার ওপর খুব শ্রদ্ধা জন্মেছিল। বিগ্ ক্লাবও তাদের মধ্যে অনেক দিন বেঁচে থেকে সুখে স্বচ্ছন্দে জীবন কাটিয়ে গেল।

(আফ্রিকার বুরুণ্ডি দেশের প্রচলিত কাহিনী)







ধার্মিক পাঙ্কা

মধ্য এশিয়ার এক সমতল তৃণভূমির কাছে কিছু তাতার বাস করত। তাদের ঘোড়ার ব্যবসা ছিল। পাঙ্কা এক সময় সেই তাতারদের ঘোড়ার পাল চরাবার চাকরি নিয়েছিল। ঘোড়াগুলোকে নিয়ে সে বছরের পর বছর ধরে পেনজা জায়গাটা পেরিয়ে একেবারে রীন পেস্‌কি মরুভূমির ধার পর্যন্ত চরিয়ে আনত। এই রীন পেসকি মরুভূমির কাছেই সেই অঞ্চলের ধনী ঘোড়া ব্যবসায়ী খান জঙ্গর রাজত্ব করে বেড়াত। সুরার হাটে যখন তার ঘোড়ার পাল নিয়ে বিক্রী করতে যেত, তখন সে খুব ভালমানুষটি সেজে থাকত। কিন্তু নিজেদের এলাকার মধ্যে এসেই সে নিজমূর্তি ধরত, আর নিজের খেয়ালখুশিমত চলত। কখন কোন লোকের ওপর অমানুষিক অত্যাচার করত, আবার কখন কাউকে ধরে নিয়ে এসে মোটা টাকা বকশিস করে ছেড়ে দিত।

সরকারী আওতা থেকে অনেক দূরে তাতারদের এই এলাকায় কী

ঘটছে না ঘটছে কেউ খোঁজও রাখত না। কাজেই খান জঙ্গরের দৌরাত্ম্য দিন দিন বেড়েই চলছিল। অবশ্য খান জঙ্গরের কিছু শত্রুও ছিল। তার মধ্যে একজন ছিল খাবিবৌলা। সে সুযোগ পেলেই খান জঙ্গরের ঘোড়ার পালে হানা দিয়ে সব থেকে ভাল ঘোড়াগুলো চুরি করে নিয়ে যেত। খান জঙ্গরের লোকেরা তাকে কিছুতেই ধরতে পারত না। কিন্তু, একদিন হল কী—তাতারদের নিজেদের মধ্যেই এক দাঙ্গায় খাবিবৌলা জখম হয়ে খান জঙ্গরের হাতে ধরা পড়ে গেল। খান জঙ্গর ঠিক করল একটু বিচারের প্রহসন করে খাবিবৌলাকে এমনি এক কড়া শাস্তি দেবে, যা দেখে অন্য সব ঘোড়া চোরেরাও শায়েস্তা হয়ে যায়। কিন্তু খান জঙ্গরকে সেদিনই এক জরুরী কাজে পেনজা সহরে যেতে হয়েছিল। কাজেই খাবিবৌলার বিচার আর তখন হল না।

এদিকে পেনজা যাবার সময় হয়ে আসছে, আর সেই অঞ্চলের কোন শাসক খাবিবৌলাকে ঐ অবস্থায় দেখে যদি কোন হাঙ্গামা বাঁধায় সেই ভয়েও, খান জঙ্গর তাড়াতাড়ি একটা ছোট ঝরনার পাশে আহত খাবিবৌলাকে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় পাঙ্গার জিম্মায় রেখে গেল। পাঙ্গাকে খানিকটা ময়দা আর এক ভিস্তি জল দিয়ে কড়া হুকুম করল, বলল, 'তোর আত্মাকে যেমন করে পাহারা দিস, এই লোকটাকেও ঠিক তেমনি করে পাহারা দিবি। বুঝেছিস্ ?'

পাঙ্গকা বলল, 'এ আর এমন কি শক্ত কাজ ! আমি ঠিকই বুঝতে পেরেছি। আপনি যেমনটি বললেন, আমি তেমনিভাবেই কাজ করব।'

খান জঙ্গর তখন তার সঙ্গী সাথীদের নিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে মেলা দেখতে পেনজাতে চলে গেল।



খান জঙ্গর চলে যাবার পর পাঙ্গকা খাবিবৌলাকে বলল, 'দেখ, তোমার অপকর্ম আজ তোমাকে কোথায় নিয়ে এসেছে। তোমার সাহস আর শক্তি দুই-ই আছে, কিন্তু সে সব তুমি ভাল কাজে না লাগিয়ে যত সব দুষ্কর্মে লাগাচ্ছ। ঐ কুপথ ছাড়লে তোমার মঙ্গলই হবে।'



খাবিবৌলা বলল, 'এতদিন নিজেকে বদলাইনি। আর এখন ত বয়স হয়ে গেছে, সময়ও নেই।'

'সময় নেই কেন? আসল কথা হচ্ছে নিজেকে শোধরাবার আন্তরিক ইচ্ছে থাকা। বাকীটা আপনা থেকেই এসে যায়। আর সবাই-এর মত তোমার মধ্যেও আত্মা বলে একটা পদার্থ আছে তো। দুষ্কর্ম থেকে সরে দাঁড়াও, দেখবে ঈশ্বর তোমাকে সৎ কাজ করতে সাহায্য করবেন। তখন থেকে সবই ভালভাবে চলতে শুরু করবে।'

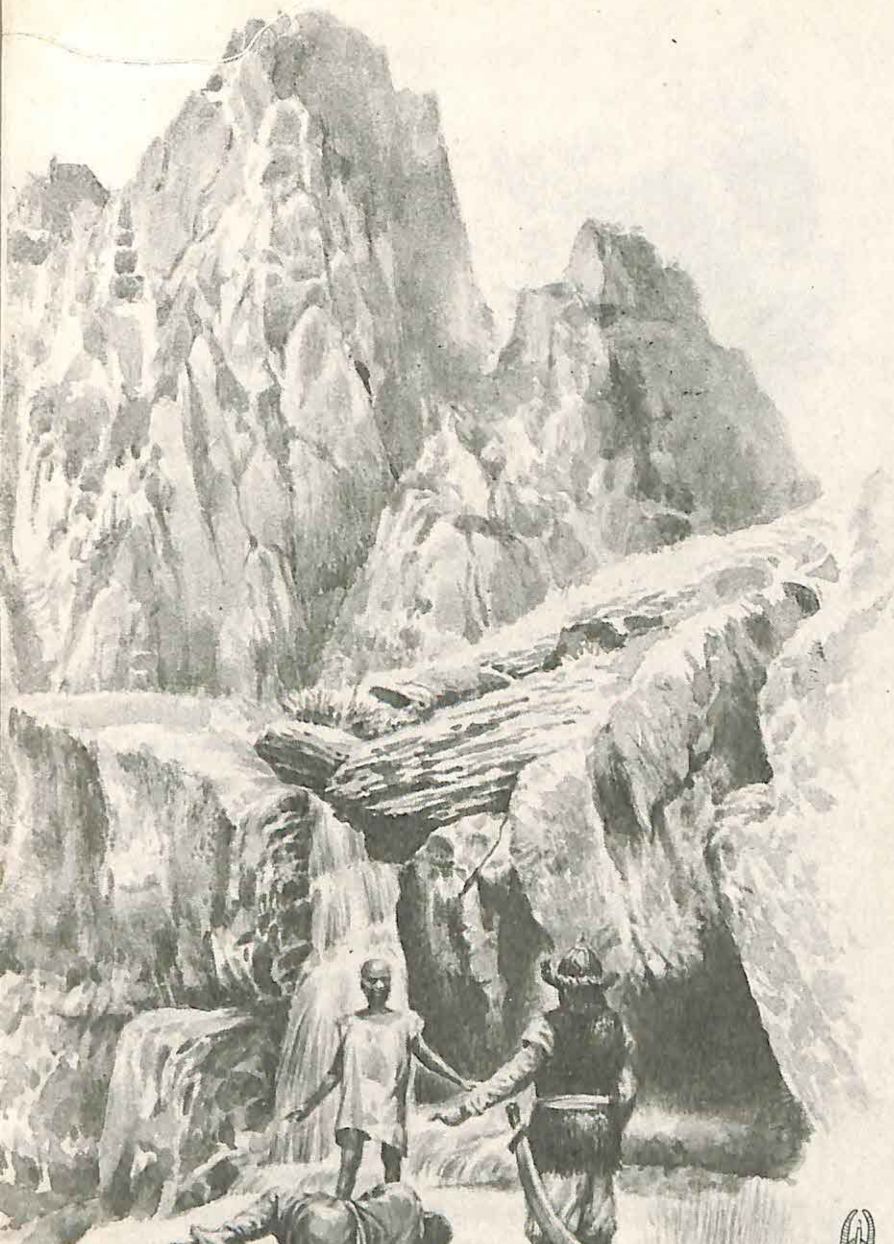
খাবিবৌলা পাঙ্গকার সব কথা শুনে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তারপর বলল, 'এখন তো আর এসব চিন্তা করে লাভ নেই!'

'কেন? লাভ নেই কেন?'

'দেখতেই তো পাচ্ছ আমি বন্দী। শুধু মৃত্যুর অপেক্ষায় বসে আছি।'

'কিন্তু আমি তোমাকে ছেড়ে দেব ঠিক করেছি।'

খাবিবৌলা যেন নিজের কানকে বিশ্বাসই করতে পারছিল না। কিন্তু পাঙ্গকা একটু হেসে বলল, 'আমি তোমার সঙ্গে পরিহাস করছি





না, সত্যি কথাই বলছি। খান জঙ্গর আমাকে হুকুম দিয়ে গেছেন যে নিজের আত্মাকে যেমন করে পাহারা দিই তোমাকে ঠিক তেমনি করে পাহারা দিতে। তুমি কি জান নিজের আত্মাকে কীভাবে পাহারা দিতে হয় ? নিজের আত্মার ওপর মায়া-মমতা রাখতে নেই, পরের জন্য তাকে উৎসর্গ করতে হয়। আর আমি সে কাজটাই করতে চাই। পরের ওপর অত্যাচার আমি মোটেই সহ্য করতে পারি না। আমি তোমার সব বাঁধন খুলে দিয়ে একটা ঘোড়ার ওপর বসিয়ে দিচ্ছি। তুমি যেখানে খুশি পালিয়ে যাও। কিন্তু যদি ফের অপকর্ম কর, তবে তুমি ঈশ্বরের কাছে মিথ্যাবাদী হয়ে থাকবে, আমার কাছে নয়।'

কথাগুলো শেষ করে পাঙ্গকা খালিবৌলার সব বাঁধন খুলে একটা ঘোড়ার জিনের ওপর বসিয়ে দিয়ে বলল, 'যাও, তুমি নির্বিঘ্নে যেখানে খুশি চলে যেতে পার।'

পাঙ্গকা তারপর খান জঙ্গরের আসার অপেক্ষায় রইল। বেশ কিছুদিন পরে খান জঙ্গর তার দলবল নিয়ে যখন মেলা দেখে ফিরল, তখন ঝরনার জল শুকিয়ে গেছে, ভিস্তিতেও সামান্য মাত্র জল পড়ে।

 খান জঙ্গর সেখানে পৌঁছেই চারদিক দেখতে লাগল। তারপর

পাঙ্গকাকে বলল, 'কই, খাবিবৌলাকে তো দেখছি না ?'

পাঙ্গকা বলল, 'আমি তাকে ছেড়ে দিয়েছি।'

'তা কি করে হয় ? তুই বলছিস্ কী আমাকে ?'

'আমি বলছি, আপনি আমাকে যেমনটি হুকুম করেছিলেন, আমি ঠিক সেই মতই কাজ করেছি। আপনি বলেছিলেন, আমি নিজের আত্মাকে যেমন পাহারা দিই, খাবিবৌলাকে সেই রকমভাবেই পাহারা দিতে। আমি আমার আত্মাকে এত ভালবাসি যে আমি চাই সে অপরের জন্য নির্যাতন ভোগ করুক। আপনার ইচ্ছা ছিল খাবিবৌলাকে খুব জ্বালা যন্ত্রণা দিয়ে মেরে ফেলবেন। কিন্তু অন্য লোকের ওপর নির্যাতন আমি সহ্য করতে পারি না। খাবিবৌলার বদলে আপনি আমাকে সেই শাস্তি দিতে পারেন। তাতে আমার আত্মাও সুখী হবে, আমার ভয়ও ভেঙ্গে যাবে। আমার আর কোন কিছুতেই ভয় থাকবে না।'

খান জঙ্গর কিছুক্ষণ নির্বাক হয়ে পাঙ্গকার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল (বোধ হয় পাঙ্গকার কথাগুলো উপলব্ধি করার চেষ্টা করছিল, আর ভাবছিল পাঙ্গকা তাকে তো ঠকায়নি, মিথ্যাও বলেনি। সে খাবিবৌলার সঙ্গে পালিয়েও যেতে পারত, তাও করেনি)। তখন সে নিজের মাথা চুলকোতে চুলকোতে সেখানে উপস্থিত আর সব সঙ্গীদের বলল, 'তোমরা সবাই কাছে এসো, আমি কী ঠিক করেছি শুনে যাও।'

সব তাতাররা কাছে এসে খান জঙ্গরকে ঘিরে দাঁড়াল। তখন সে মৃদুকণ্ঠে বলল, 'পাঙ্গকার এই সব কথার পর তাকে কেউ মেরে ফেলতে বলবে বলে বিশ্বাস হয় না, কারণ মনে হচ্ছে ওর মধ্যে দেবদূত বাস করে।'

সব তাতাররাও ফিস্ ফিস্ করে বলল, 'আপনি ঠিকই বলেছেন। পাঙ্গকাকে কোনভাবেই আঘাত করা উচিত হবে না। সে অনেকদিন ধরে আমাদের কাছে কাজ করছে। কিন্তু আমরা ওকে ঠিক বুঝতে পারিনি। এখন যেন এক লহমায় ওকে চিনে গেলুম। মনে হচ্ছে পাঙ্গকা সত্যিই খুব ধার্মিক লোক।'

(রাশিয়ার গল্প, লেখক নিকোলাই লেসকো, ১৮৩১—৯৫)





এক ভূমিদাসের স্বপ্ন

দক্ষিণ আমেরিকার পেরু রাজ্যে এক জমিদারের অনেক ভূমিদাস ছিল। তাদের প্রত্যেককে পালা করে মনিবের প্রাসাদে দাসত্ব করতে হত। একবার এক রেড ইণ্ডিয়ানের কাজ করার পালা এল। রেড ইণ্ডিয়ানটা ছিল মাথায় যেমন ছোটখাট, তেমনি গরীব আর ভীতু। তার পোশাকও ছিল নোংরা ছেঁড়া।

এই ভূমিদাস এসে মনিবকে যখন আভূমি নত হয়ে সেলাম জানাল, মনিব তো তার দিকে চেয়ে হেসেই খুন। সেখানে উপস্থিত আর সব ভৃত্যদের সামনেই তাকে বলল, 'হ্যাঁরে, তুই সত্যিই একটা মানুষ তো ? না অন্য কিছু ?'

ভূমিদাস এ কথার কী আর উত্তর দেবে। সে ভয়ে জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

 মনিব বলল, 'আচ্ছা দেখা যাক ! ঐ কদাকার ছোট ছোট হাত

দুটো দিয়ে অন্তত থালা-বাসনগুলো মাজতে পারবে, ঝাঁটা দিয়ে ঘরদোরও পরিষ্কার করতে পারবে।' বাবুর্চিখানার এক কর্মচারীকে ডেকে মনিব বলল, 'এই কুৎসিত লোকটাকে সামনে থেকে সরিয়ে নিয়ে যাও।'

এই সব কথা শুনে রেড ইণ্ডিয়ান ভূমিদাসের মন খুবই খারাপ হয়ে গেল। সে হাঁটু গেড়ে বসে মনিবকে আবার সেলাম করে বাবুর্চিখানার কর্মচারীর সঙ্গে চলে গেল।

দেখতে ছোটখাট হলেও সেই ভূমিদাসের গায়ে শক্তি ছিল সাধারণ লোকের মতই। তাকে যা কিছু কাজ করতে দেওয়া হত, সে ভালভাবেই করতে পারত। কিন্তু তার মুখে-চোখে সর্বদাই একটা ভয় ভয় ভাব থাকত। তাকে দেখে কোন কোন ভৃত্য হাসাহাসি করত, আবার অনেকে তাকে করুণার চোখেও দেখত। এক রাঁধুনী তাকে দেখে বলত, 'আহাঃ! অনাথের শিশু অনাথই হয়েছে। যেমন চোখের দৃষ্টি শীতল, তেমনি বুকভরা দুঃখ!'

এই ভূমিদাস কোন কথাই বলত না, মুখ বুজে নিজের কাজ করে যেত ; যা খেতে দেওয়া হত নীরবেই খেয়ে নিত। কিন্তু তার মধ্যে সর্বদা একটা আতঙ্কের ভাব, তার শতছিন্ন পোশাক, আর তার এই নীরবতার জন্যই বোধহয়, মনিব তাকে খুবই অবজ্ঞা করত।



রোজ সন্ধ্যাবেলা মনিবের খাস কামরায় সব ভৃত্যরা জড়ো হয়ে প্রার্থনা সংগীত গাইত। সেখানে সেই ভৃত্যদের সামনেই মনিব এই ছোটখাট ভূমিদাসকে নানা রকমে হেনস্তা করত ; তাকে মনে করত যেন একটা কাঁচা চামড়ার বাণ্ডিল। কখনো তার মাথাটা চেপে ধরে তাকে বসিয়ে দিত, কখনো গালে চড় মারত। তাকে দেখিয়ে বলত, 'আমার মনে হয় এটা একটা কুকুর। এই, কুকুরের মত ডাক।'

সে কুকুরের মত ডাকতে পারত না।

মনিব তখন বলত, 'নে, চারপায়ে হাঁট।'

তখন বেচারী সেই হুকুম শুনে কুকুরের মত চার পায়ে হাঁটত।

মনিব বলত, 'এবার কুকুরের মত পাশ ফিরে শুয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে চল।' সে তখন ছোট কুকুরের মত মেঝেতে গড়াত। আর মনিব

সেই দেখে দুলে দুলে সারা শরীর কাঁপিয়ে হাসত। ভূমিদাস গড়িয়ে গড়িয়ে ঘরের দেওয়ালের কাছে পৌঁছলে মনিব হুকুম করত, 'এবার গড়িয়ে গড়িয়ে ফিরে আয়।'

সে তখন তেমনি ভাবেই গড়িয়ে গড়িয়ে ফিরে এসে ক্লান্ত হয়ে হাঁপাত। তার এই লাঞ্ছনা দেখে ভৃত্যদের মধ্যে অনেকে গুনগুন করে প্রার্থনা সঙ্গীত গেয়ে মনিবের অলক্ষ্যে নিজেদের চাপা দীর্ঘশ্বাসটা ফেলে মনোবেদনা লাঘব করত।

মনিবের আবার হুকুম হত, 'এবার খরগোসের মত কান দুটো খাড়া কর। নে, এবার উবু হয়ে বসে হাতদুটো জোড়া কর।'



সেই ভূমিদাস কান দুটো খাড়া করতে পারত না, তবে আর সবগুলো পর পর করে যেত ; যেন সে ছোটবেলা থেকেই এগুলো অভ্যাস করে এসেছিল। ভৃত্যদের মধ্যে কয়েকজন ভূমিদাসের এই নিগ্রহ দেখে হাসাহাসিও করত।

সব শেষে মনিব তার জুতোপরা পা দিয়ে লাথি মেরে তাকে টালির শক্ত মেঝের ওপর ফেলে দিত। আর তারপর সারি বেঁধে দাঁড়ান ভৃত্যদের দিকে তাকিয়ে বলত, 'এসো, এবার প্রার্থনা সঙ্গীত গাওয়া যাক।'

ভূমিদাস ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াত, কিন্তু তখন সে আর প্রার্থনা করতে পারত না, প্রার্থনা করার মত মনের অবস্থাও তার থাকত না। এই পরিবেশে কারই বা প্রার্থনা সঙ্গীত গাইতে ইচ্ছে করে!

অন্ধকার নেমে এলে সকলে যখন মনিবের খাস কামরা ছেড়ে নিজের নিজের বাসার দিকে যেতে শুরু করত, মনিব তখন ভূমিদাসকে অবজ্ঞা ভরে বলত, 'যা, দূর হয়ে যা ঘর থেকে।'

মনিবটা প্রত্যেক দিনই সব ভৃত্যদের সামনে ভূমিদাসকে এইভাবে লাঞ্ছিত করত। তাকে জোর করে হাসাত, জোর করে কাঁদাত। অন্য সব ভৃত্যদের কাছে তাকে এক উপহাসের পাত্র করে তুলেছিল।



এমনি এক সন্ধ্যায় যখন মনিবের খাস কামরায় প্রার্থনা সঙ্গীতের জন্য সব ভৃত্যরা জড়ো হয়েছিল, সেই ভূমিদাস মনিবের দিকে চেয়ে খুব স্পষ্টভাবে কথা বলতে শুরু করল। তার চোখেমুখে তখনও আতঙ্কের ছাপ।

সে বলল, 'হুজুর আমার মা-বাপ। আমাকে কিছু বলার অনুমতি দিন।'

মনিব যেন নিজের কানকে বিশ্বাসই করতে পারছিল না। সে জিজ্ঞাসা করল, 'কে ? এই কথাগুলো কে বলল ? তুই ? না অন্য কেউ ?'

অনুনয়ের সুরে সে বলল, 'আপনার সঙ্গে কথা বলার জন্য অনুমতি চাইছি। আপনি আমার মা-বাপ। আমি আপনার সঙ্গেই কথা বলতে চাই।'

তাচ্ছিল্যের সঙ্গে মনিব বলল, 'যদি কথা বলতে পারিস তো বল।'

তখন সেই ভূমিদাস বলতে শুরু করল, 'আপনি আমার মা-বাপ, আমার প্রভু, আমার সর্বস্ব! আমি কাল একটা স্বপ্ন দেখেছি। দেখলাম যে আপনি আর আমি, আমরা দুজনেই মরে গেছি, দুজনেরই মৃত্যু হয়েছে।'

'তুই মরেছিস ? আমার সঙ্গে ? বল, বল, সব কথা বলে যা', মনিব বলল।

'প্রভু, মরে যাবার পর আমরা দুজনেই সম্পূর্ণ বিবস্ত্র অবস্থায় যমরাজের সামনে হাজির হলাম।'

'তারপর কী হল, বল' মনিবের মনে তখন কিছু রাগ আর কিছু উত্তেজনা জমে উঠেছিল ; অথচ সে কৌতূহলও দমন করতে পারছিল না। ভূমিদাস বলল, 'মৃত ও বিবস্ত্র অবস্থায় তাঁর সামনে পেয়ে যমরাজ যেন দিব্যচক্ষু দিয়ে আমাদের পরীক্ষা করতে



লাগলেন ; আপনাকে এবং আমাকে, দুজনকেই। আমাদের দুজনের মনটাও যেন যাচাই করে দেখছিলেন। বোধ হয় দেখছিলেন আমরা কী ছিলাম, আর এখন কী হয়েছি। অবশ্য আপনি ধনী ও মহৎ, যমরাজ সেজন্য আপনার দিকেই বেশি দৃষ্টি দিচ্ছিলেন।'

'আর তুই ?'

'প্রভু, আমি কেমন ছিলাম তাও জানি না, আমার মূল্য কী, তাও জানি না।'

'বেশ, তারপর বলে যা।'

'তারপর যমরাজ হুকুম করলেন, "এক অতি সুদর্শন দেবদূতকে এদিকে পাঠিয়ে দাও। সঙ্গে সেই রকমই দেখতে এক ছোট দেবদূত





যেন সোনার বাটিতে একবাটি সোনার বর্ণ স্বচ্ছ মধু নিয়ে আসে।"

'তারপর ?'

'প্রভু, যমরাজের আদেশের সঙ্গে সঙ্গেই সকালের সূর্যের মত ঝলমল করতে করতে এক দেবদূত উপস্থিত হলেন, এবং ধীর পায়ে যমরাজের সামনে গেলেন। তার পিছনেই এলেন টাট্‌কা ফুলের মত সুন্দর এক ছোট দেবদূত ; তার হাতে ছিল সোনারবাটি ভর্তি সোনার বর্ণ মধু।'

'তারপর— ?' মনিবের যেন আর ধৈর্য ধরছে না।

'যমরাজ বড় দেবদূতকে আদেশ করলেন, "ঐ মধু এই সম্ভ্রান্ত



লোকটির সারা শরীরে মাখিয়ে দাও। মধু যখন মাখাবে তোমার হাত যেন পালকের মত নরম থাকে।" সেই সুদর্শন দেবদূত নিজের হাতে আপনার দেহের মাথা থেকে পায়ের বুড়ো আঙ্গুল পর্যন্ত মধু মাখিয়ে দিল। আপনি তখন সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। মধু মাখানো হবার পর আপনার দেহ স্বর্গীয় প্রভায় ঝলমল করতে লাগল ; মনে হচ্ছিল আপনার দেহটা যেন স্বচ্ছ সোনা দিয়ে তৈরি।'

মনিব এই কথা শুনে খুব খুশির সঙ্গেই বলল, 'ঠিক যেমনটি হওয়া উচিত, সেই রকমই দেখেছিস। আর, তোর কী হল বল।'

'আপনি যখন ঐ স্বর্গীয় প্রভায় ঝলমল করছিলেন, তখন যমরাজ বললেন, "দেবদূতদের মধ্যে সব থেকে যে কদাকার তাকে পাঠিয়ে দাও। সে যেন এক টিন ভর্তি মানুষের বিষ্ঠা সঙ্গে আনে।"

'আর, তারপর ?'

'বুড়ো, কুঁজো, সারা শরীরের চামড়া ফাটা, ডানা-ভাঙ্গা এক অতি কদাকার দেবদূত ক্লান্ত পায়ে যমরাজের সামনে এসে দাঁড়াল ; তার

হাতে একটা বড় টিন ভর্তি মানুষের বিষ্ঠা । এই হতভাগা দেবদূতকে যমরাজ বললেন, "এই বুড়ো, শোন্, তোর ঐ টিনে যে মানুষের বিষ্ঠা আছে, এই বেঁটে লোকটার গায়ে মাখিয়ে দে ; সারা গায়ে ভাল করে লাগিয়ে দিবি ।" তখন সেই বুড়ো কুঁজো দেবদূত তার গেঁটে গেঁটে আঙ্গুল দিয়ে টিন থেকে বিষ্ঠা নিয়ে আমার গায়ে ধাবড়া ধাবড়া করে লাগাতে শুরু করল ; লোকে যেমন করে দেওয়ালে কাদা ছোঁড়ে, ঠিক তেমনি করে । আমি স্বর্গের সেই আলোর মধ্যে লজ্জায় জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম ; আর চারদিক দুর্গন্ধে ভরে গেল··· ।'

মনিব বলল, 'ঠিক যেমনটি হওয়া উচিত ।' তারপর একটু থেমে বলল, 'বলে যা, না এখানেই শেষ ?'

'না, প্রভু ; আমরা দুজনে যখন ঐ অবস্থায় যমরাজের সামনে দাঁড়িয়েছিলাম, তিনি আবার নতুন করে আমাদের দেখতে লাগলেন । আপনাকে আমাকে দুজনকেই অনেকক্ষণ ধরে দেখলেন । যে দৃষ্টি দিয়ে তিনি স্বর্গের অসীম গভীরতাকে উপলব্ধি করেন ; যে দৃষ্টিতে দিন ও রাত্রি, স্মৃতি ও বিস্মৃতি সব একাকার হয়ে যায় ; সেই দৃষ্টি দিয়ে তিনি আমাদের দেখছিলেন । কিছুক্ষণ ঐভাবে দেখে তিনি আমাদের বললেন, "দেবদূতদের যা করার ছিল, সে কাজ তারা শেষ করেছে । এখন তোমরা দুজনে পরস্পরের গা চাটতে থাক—ধীরে ধীরে, এবং অনেকক্ষণ ধরে চাট ।"

'দেখলাম সেই বুড়ো কুঁজো দেবদূতটা যমরাজের এই আদেশের সঙ্গে সঙ্গে এক সুন্দর যুবার মূর্তি ধারণ করল, তার সেই ভাঙ্গা ডানা দুটোও নতুনের মত ঝক্‌মক্ করতে লাগল । যমরাজ তখন এই দেবদূতকে নির্দেশ দিলেন আমরা দুজন তাঁর হুকুম মত কাজ করি কি না কড়া নজর রাখতে ।'

(পেরু রাজ্যের অন্তর্গত কুসকো প্রদেশের উপকথা)





কলসী-রাণী

অনেকদিন আগেকার কথা। একটা লোকের বারোটা ছেলেমেয়ে হয়েছিল। কিন্তু বরাত এমন যে একে একে সবগুলো জন্মাবার কয়েক মিনিটের মধ্যেই মরে গেল। তের বারের বার যে সন্তান হল, দুঃখী মা-বাবাকে সান্ত্বনা দেওয়া দূরে থাক, সে তাদের এক গভীর হতাশা এনে দিল। কোথায় একটা সুন্দর ফুটফুটে ছেলে জন্মাবে, না তার বদলে জন্মাল একটা কলসী! পোড়া কপাল আর কাকে বলে! সেই কলসী দেখে মা-বাবার বুদ্ধি-শুদ্ধি তো লোপ পেয়ে গেল। কলসী হয়ত কোন অমঙ্গল আনতে পারে এই ভাবনাই তাদের পেয়ে বসল। শেষে তারা এই অমঙ্গল থেকে মুক্তি পাবার জন্য ঘরবাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যাবার মতলব করল।

সেই পরিবারের সবাই—কলসীর মা-বাবা ঠাকুরমা-ঠাকুরদা চাকর-চাকরাণী—এই অবাঞ্ছিত অলক্ষুণে ডাইনীটাকে ফেলে রেখে একদিন সত্যিসত্যিই বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল। কিন্তু তারা যেই না

রাস্তায় পা দিয়েছে, অমনি কলসীটা গড়াতে গড়াতে তাদের পিছনে এসে চেঁচিয়ে বলল, 'ও কলসীর বাবা, তোমার কলসীর জন্য একটু দাঁড়াও।' এই কথা যেই না শুনেছে, তারা যত জোরে পারল ছুটতে শুরু করে দিল। কলসীটা তখন তাদের অনেক পিছনে পড়ে গেল। সঙ্গে আর এক দুর্ভাগ্য এসে জুটল—তারা সবাই যখন পথে, তখন মুষল ধারে বৃষ্টি নামল। লোকগুলো অবশ্য কাছাকাছি একটা বাড়িতে ঢুকে পড়েছিল। কিন্তু বেচারী কলসী সেই বৃষ্টির জলে ভেসে চলল। ভাসতে ভাসতে সে এক গভীর বনের মধ্যে গিয়ে পড়ে রইল।

বৃষ্টি থামতে কলসীর মা-বাবা, আর সবাই হাঁটতে হাঁটতে অন্য একটা রাজ্যে গিয়ে পৌঁছল। সেখানে পৌঁছে তারা নিশ্চিন্ত হল যে সেই ভয়নক ডাইনীটা আর তাদের ধরতে পারবে না। তখন সেই দেশের রাজপুত্রের কাছে গিয়ে তারা আশ্রয় চাইল। রাজপুত্রও তাদের বসবাস করার জন্য যথেষ্ট জমি জায়গা দিল।



এই ঘটনার বেশ কয়েক বছর পরে একবার সেই রাজপুত্র মৃগয়ায় গিয়েছিল। ঘুরতে ঘুরতে একদিন সে, যে বনে সেই অদ্ভুত কলসীটা বৃষ্টির জলে ভেসে এসেছিল, সেই বনে হাজির হল। সেখানে শিকার খুঁজতে খুঁজতে রাজপুত্র দেখতে পেল একটা সুন্দর কলসী পড়ে আছে। কলসীটা দেখে রাজপুত্রর খুব ভাল লাগল। সে তার লোকজনকে বলল কলসীটা নিয়ে গিয়ে প্রাসাদে সাজিয়ে রাখতে। তারাও সেটা এনে রাজপ্রাসাদে অন্যান্য বাসনপত্তরের সঙ্গে সাজিয়ে রেখে দিল।

প্রাসাদে কলসীটা নিয়ে আসার পর থেকে এক আশ্চর্য ব্যাপার ঘটতে শুরু হল। রাজপুত্র যখন প্রাসাদ থেকে চলে যেত, এক পরমা রূপবতী কন্যা সেই কলসী থেকে বেরিয়ে এসে সমস্ত প্রাসাদ পরিষ্কার করত ; বাসন-কোসনগুলোও মেজে ঘষে ধুয়ে মুছে চকচকে করে সুন্দরভাবে সাজিয়ে রাখত। সব সাজান-গোছান শেষ করে সে আবার কলসীর মধ্যে ঢুকে নিজেকে বন্ধ করে রেখে দিত। দাসীরা প্রাসাদে কাজ করতে এসে দেখত তাদের সমস্ত কাজ আগেই কে করে রেখে দিয়েছে। তারা ভাবল এত ভারী মজার ব্যাপার ! কিন্তু


89

পর পর দু'চার দিন ঐ ঘটনা ঘটতে দেখে তারা রাজপুত্রকে সে কথা জানাল।

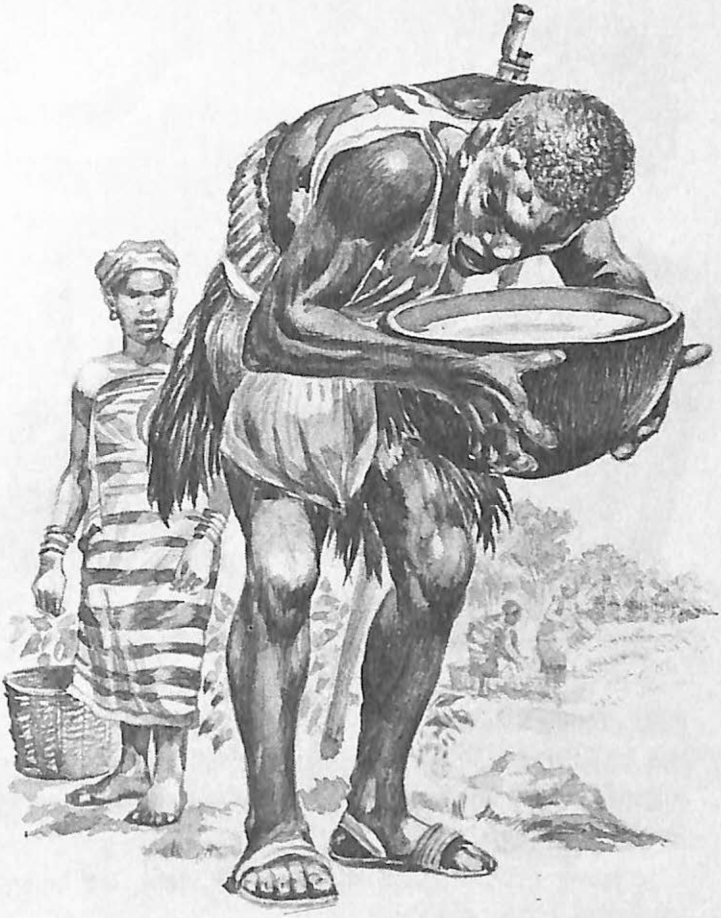
রাজপুত্র সব শুনে, কী করে এই রহস্যজনক ঘটনা ঘটছে দেখবার জন্য একদিন একটু আড়ালে লুকিয়ে বসে রইল। কিছুক্ষণ বাদে সে দেখতে পেল সেই কুড়িয়ে পাওয়া কলসী থেকে পরমা সুন্দরী এক মেয়ে বেরিয়ে এসে প্রাসাদের বাসন পরিষ্কার করতে শুরু করল। মেয়েটি যেই হেঁট হয়ে ময়লা তুলতে যাবে, সেই সুযোগে রাজপুত্র এসে তাকে ধরে ফেলল। তারপর তাকে বলল,'তুমি ঐ মৃত জগতে রয়েছ কেন? আমাদের জীবন্ত জগতে এসো।' তখন রাজপুত্র সেই পরমা রূপবতী মেয়েকে বিয়ে করে প্রাসাদে বাস করতে লাগল। সেই কলসী মেয়ে রাণী হয়ে গেল।

রাজপুত্রের সঙ্গে বিয়ে হবার পর মেয়েটা দেখত যে তার বাবা আর ঠাকুরদা, যারা তাকে ফেলে পালিয়ে গিয়েছিল, তারা রাজ দরবারে যাতায়াত করছে। তখন সে রাজপুত্রকে অনুরোধ করল প্রাসাদের মধ্যে তাদের একদিন নিমন্ত্রণ করতে। কলসীর বাবা আর ঠাকুরদা যখন প্রাসাদের ভেতরে এল, রাণী কলসীর মধ্যে লুকিয়ে থেকে চেঁচিয়ে বলল, 'ও কলসীর মা-বাবা ঠাকুরমা-ঠাকুরদা, তোমাদের কলসীকে দেখ।' এই কথা বলে কলসী থেকে বেরিয়ে এসে সে বলল, 'নিজের সন্তানকে কখনও ফেলে দিতে নেই। সেও তো মানুষ। তার সঙ্গে মানুষের মত ব্যবহার করা উচিত নয় কি?'

এই সব কথা শুনে কলসীর বাবার প্রথমে খুব ভয় হয়েছিল। তারপর মনে পড়ল তাদের সেই কলসী-সন্তানের কথা, তখন বুঝল এই কলসী মেয়েই তাদের সেই সন্তান। সেই কলসী মেয়ে এখন রাণী হয়েছে দেখে তাদের খুব আনন্দ হল। তারপর থেকে রাজপুত্র, কলসী-রাণী, তার মা-বাবা, ঠাকুরমা-ঠাকুরদা সবাই মিলেমিশে সুখে-স্বচ্ছন্দে দিন কাটাতে লাগল।

(আফ্রিকার বরুণ্ডি দেশের কাহিনী)





কৃপণ মেয়ে ও কুষ্ঠরোগী

আফ্রিকার কঙ্গো দেশে এক কুষ্ঠরোগী জঙ্গলে শিকার করতে গিয়েছিল। সেদিন খুব গরম পড়েছিল। দুপুরের দিকে ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় কাতর হয়ে সে তার শিকারী কুকুরগুলো নিয়ে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এক চীনেবাদাম খেতের সামনে পৌঁছল। সেই খেতে অনেক মেয়ে কাজ করছিল। তাদের দেখে সে ভাবল মেয়েগুলো তাকে যদি চীনেবাদাম না-ও দেয়, একটু জল চাইলে নিশ্চয়ই 'না' করবে না।

জঙ্গল থেকে বেরিয়ে সামনেই যে মেয়েটাকে দেখতে পেল, তাকে সে বলল, 'মা, আমাকে একটু জল দাও না, আমার খুব তেষ্টা পেয়েছে।'



সেই মেয়েটা শিকারীর কুষ্ঠরোগ আছে দেখে বলল, 'হ্যাঁ, তুই তো কুটে, তোকে আমি জল দেব ! না, না, না ! আমার কাছে জলটল নেই । আমি তোকে কিসের জন্যে জল দিতে যাব ? কী ! তুই আমার লাউথালী* থেকে জল নিয়ে খাবি ! আস্পর্ধা তো কম নয় ! যা, তুই নিজের হাত চুষগে যা ।'

কুষ্ঠরোগী বলল, 'মা, এই গাছের পাতাটা ধরছি, এই পাতাতে একটু জল ঢেলে দাও ।'

মেয়েটার কিন্তু একটুও দয়া হল না । সে সোজা বলে দিল, 'তোকে দেবার মত জল আমার নেই । যা, ভাগ ।'

সেখান থেকে একটু দূরে আর একটা মেয়ে কাজ করছিল । সে এদের সব কথা শুনে কুষ্ঠরোগীকে ডেকে বলল, 'তুমি এদিকে এসো, আমার ঐ লাউথালী থেকে জল নিয়ে খাও ।'

কুষ্ঠরোগী তার কাছে গিয়ে বলল, 'না, আমি লাউথালী থেকে জল খাব না । আমি হাত পাতছি, তুমি জল ঢেলে দাও, আমি খাই ।'

মেয়েটা বলল, 'ভালমানুষের ছেলে, যা বলছি শোন, তুমি লাউথালী থেকেই জল খাও ।'

কুষ্ঠরোগীর জল খাওয়া শেষ হলে মেয়েটা বলল, 'তোমার

* (লাউয়ের শুকনো আবরণের জলপাত্র)

কুকুরগুলোও তো তেষ্টায় ধুঁকছে। ওদের একটু করে জল দাও।'

এইভাবে তৃষ্ণা মিটিয়ে লোকটা এক আরামের দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'লক্ষ্মী মেয়ে, তোমাকে অনেক ধন্যবাদ। আমি অনেকটা জল খেয়েছি।' কথাগুলো বলে সে মেয়েটাকে হাত তুলে নমস্কার করল।

মেয়েটা তাকে আরও কিছু জল আর এক চুপড়ি চীনেবাদাম খেতে দিল। লোকটা তখন তার ঝোলার মধ্য থেকে খানিকটা শিকারের মাংস বার করে মেয়েটাকে দিল। মাংসর টুকরোটা নিতে গিয়ে মেয়েটা ভয়ে শিউরে উঠেছিল। সেই দেখে কুষ্টরোগী তাকে বলল, 'মা, ভয় পেয়ো না। গ্রামে ফিরে গিয়ে মাংসটা খেয়ো। এ মাংস খেলে তোমার কুষ্ঠ হবে না। আর, ঐ যে মেয়েটা আমাকে জল দিল না, ওরা কোন জাতের আমাকে বলে দাও।'

এই মেয়েটা বলল, 'ওরা হচ্ছে বা-কিন্তি-ডুম্বু-কাঁসা-মায়ালা জাতের।'

লোকটা তখন মাথা চুলকে বলল, 'বেশ ভাল! ওদের জাতের লোক যেমন আমাকে তেষ্টার জল দেয়নি, তেমনি, ওরা যদি কোন চিতল হরিণ বা ডোরাকাটা হরিণ জাতের কোন জন্তুর মাংস খায়, তাহলেই ওদের বংশের সকলের কুষ্ঠ হবে, তাদের ছেলেমেয়েদের কুষ্ঠ হবে, তাদের নাতিনাতনীদের, আবার তাদের নাতিনাতনীদেরও কুষ্ঠ হবে, এই কথা বলে দিলাম।'

তারপর কুষ্ঠরোগী তার ঝোলা আর কুকুরগুলো নিয়ে চলে গেল।



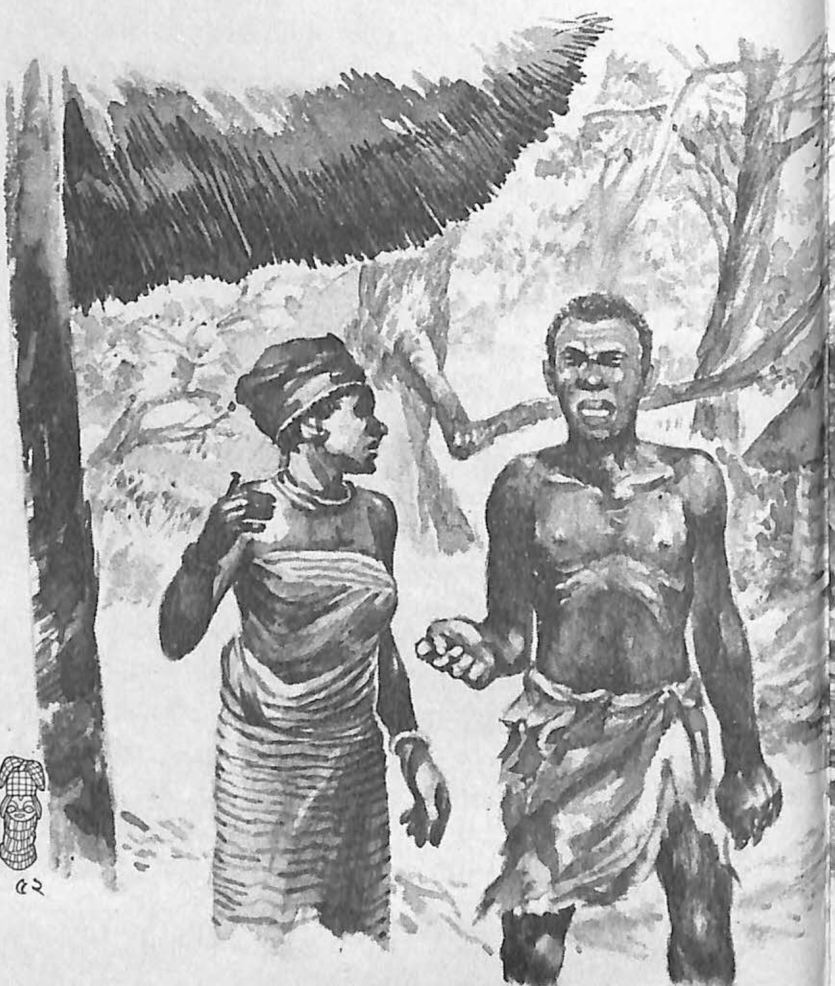
বেলা পড়লে মাঠের কাজ শেষ করে মেয়েরা সব গ্রামে ফিরে এল। রাতে খাবার পর যখন সবাই শুয়ে পড়তে যাচ্ছিল তখন তাদের পুরুষগুলো একটা ডোরাকাটা বড় জানোয়ার শিকার করে নিয়ে এল। সেটার মাংস তারা নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিয়েছিল। কুষ্ঠরোগীকে যে কৃপণ মেয়েটা জল দেয়নি, সেও এক ভাগা মাংস পেয়ে, তাকে বেশ করে ঝলসে, খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়ল।

পরের দিন সকালে উঠে সে দেখল তার মাথা থেকে পা পর্যন্ত কুষ্ঠের ঘায়ে ভরে গেছে। সেই দেখে তার স্বামী অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা

করল, ‘কী হল তোমার ?’

মেয়েটা বলল, ‘এই ঘাগুলো—জানি না এগুলো কী ! দেখ না, এক রাত্তিরের মধ্যেই সারা গা ভরে গেছে।’

মেয়েটার স্বামী বলল, ‘কী ব্যাপার আমিও ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। কাল যখন মাঠ থেকে কাজ করে ফিরলে তখনও ভালই ছিলে। রাতে আমরা বাড়িতেই ঘুমিয়েছি। আর সকালে উঠেই দেখি তোমার সারা গা ঘায়ে ভর্তি। আমি না হয় একবার ওঝার কাছে গিয়ে ব্যাপারটা জিজ্ঞাসা করে আসি। কোথা থেকে কী হল, সে যদি কিছু বলতে পারে।’

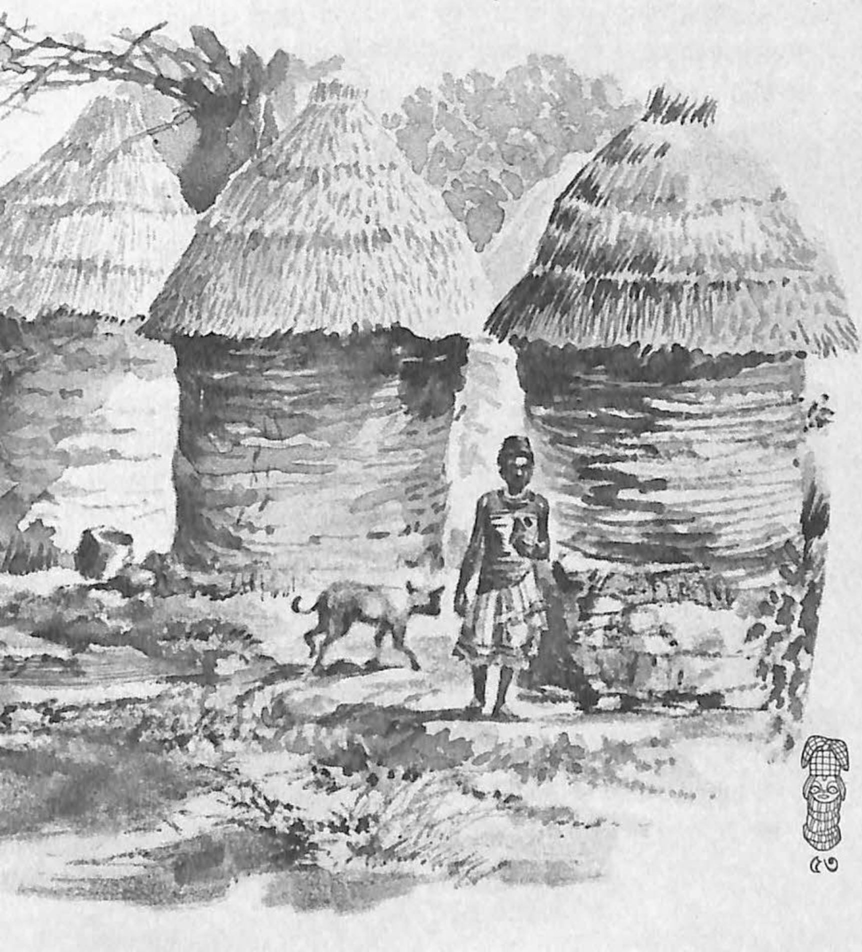


যখন মেয়েটার স্বামী এসব কথা বলছিল, পাশের বাড়ি থেকে একটা মেয়ে চেঁচিয়ে বলল, 'তুমি এদিকে এসো, আমি তোমাকে সব বুঝিয়ে দিচ্ছি।'

সেখানে যেতে মেয়েটা তাকে বলল, 'তুমি বলছিলে যে ওঝার কাছে যাবে পরামর্শ করতে। কিন্তু এ সবই তো জানা ব্যাপার।'

লোকটা বলল, 'তুমি তো কাল ওর সঙ্গে মাঠে কাজ করতে গিয়েছিলে। সেরকম যদি কিছু দেখে থাক, বল।'

মেয়েটা বলল, 'আমরা কাল চীনেবাদাম খেতে কাজ করতে গিয়েছিলাম। যাবার পথে যে যার লাউথালীতে জল ভর্তি করে নিয়ে



যাই। মাঠে কাজ করতে করতে যখন দুপুর গড়িয়ে এসেছে, হাতে বন্দুক, কাঁধে শিকারের ঝোলা আর সঙ্গে কয়েকটা কুকুর নিয়ে একটা শিকারীকে আমাদের দিকে আসতে দেখলাম। প্রথমে সে তোমার বউ-এর কাছে গিয়ে বলেছিল, "ও ভালমানুষের মেয়ে, আমাকে একটু জল দাও না। খুব তেষ্টা পেয়েছে।" তোমার বউ তাকে বলল, "কি— ! তোর ঐ ভীষণ কুষ্ঠ, আর আমি তোকে জল দেব ! তোকে দেবার মত জল আমার নেই," তখন লোকটা অনুনয় করে বলল, "আমি এই গাছের পাতাটা ধরছি, এই পাতাতে একটু জল ঢেলে দাও।"

তখন তোমার বউ তাকে বলল, "যা-যা ! আমার জাতের লোকেরা কি তোকে এখানে আসার জন্য মাথার দিব্যি দিয়েছে ?"

এইসব কথা শুনে আমি সেই শিকারীকে ডেকে বললাম, "তুমি এদিকে এসো, ওখানে আমার লাউথালীতে জল আছে, খাও।" সে আমার কাছে এসে হাত দুটো পেতে বলল, "তুমি হাতে জল ঢেলে দাও, আমি খেয়েনি।" আমি বললাম, "না-না, তুমি ঐ লাউথালী থেকেই জল খাও।" সেই লোকটা লাউথালী থেকে জল নিয়ে খেলে লাউথালীর কি কুষ্ঠ হবে ? তুমিই বল না ? সেই লোকটা প্রাণভরে জল খেয়ে নেবার পর আমি তার কুকুরগুলোকেও একটু করে জল দিলাম। তখন সে তার ঝোলা থেকে খানিকটা শিকারের মাংস আমাকে দিয়ে বলল, "তুমি এই মাংসটা খেয়ো ; কোন ভয় নেই, তোমার কুষ্ঠ হবে না। এখন বলতো ঐ যে মেয়েটা আমাকে জল দিল না, সে কোন জাতের মেয়ে ?" আমি তাকে তোমাদের জাতের নাম বলে দিয়েছিলাম। তখন সে মাথা চুলকে তোমার বউকে শাপ দিয়ে বলল, "বেশ ! ঐ জাতের মেয়েটা যেমন আমাকে তেষ্টার জল দেয়নি, তেমনি তাদের বংশের কেউ যদি চিতল হরিণ বা ডোরাকাটা হরিণজাতের কোন জন্তুর মাংস খায়, তাদের সব কুষ্ঠ হবে, সে ঙাকাই হরিণই হোক, বা সোঁম্বি-হরিণই হোক। আর যতটুকুই খাক— তাদের গা কুষ্ঠে ভরে যাবে ; তাদের ছেলেমেয়েদের, নাতিনাতনীদের, আবার তাদের নাতিনাতনীদের সকলের কুষ্ঠ হবে এই কথা বলে দিলাম।" এই সব শাপ দিয়ে লোকটা চলে গেল।

'চীনেবাদাম কুড়িয়ে গ্রামে ফিরতে কাল বেশ সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল। গ্রামে ফিরেই তোমাকে কথাটা বলব ভেবেছিলাম ; কিন্তু, কি জানি কেন ভুলে গেলাম। আর কালকেই তোমরা ঐ হরিণটা

মেরেছিলে। তার একটা ভাগাও তোমরা আনলে। আর তোমার বউ নিশ্চয়ই কিছুটা খেয়েছে।"

লোকটা বলল, "হ্যাঁ, সে খানিকটা মাংস খেয়েছে তো। আমরা খেয়েদেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। সকালে উঠে হঠাৎ দেখলাম তার সারাটা গা ঘায়ে ভরে গেছে।"

মেয়েটা বলল, 'কুষ্ঠরোগী যা শাপ দেবার সে তো দিয়েইছে। ব্যাপারটা সব পরিষ্কার বুঝলে তো! এসব শোনার পরও কি তুমি ওঝার কাছে গিয়ে-গুচ্ছের টাকা নষ্ট করতে চাও?'

সব কথা শুনে লোকটা ঘরে ফিরে গেল।

তারপর থেকে সেই নির্দয় কৃপণ মেয়েটার কী শাস্তিটাই না হল। দিন দিন তার সারা শরীর কুষ্ঠের ঘায়ে ভরে গেল। আর তাদের বংশের যারাই চিতল হরিণ, অথবা ডোরাকাটা হরিণজাতের কোন জন্তুর মাংস খেত, তাদেরই কুষ্ঠ হত। একবার মাত্র এক কুষ্ঠরোগীকে তৃষ্ণার জল না দেওয়ার জন্য তারা বংশপরম্পরায় ভীষণ কুষ্ঠব্যাধিতে ভুগতে লাগল।

(কঙ্গোর একটি প্রচলিত গল্প)





সাহসী গোরো-বে-ডিক্কো

আফ্রিকার ফুলানি জাতের লোকেরা ছিল যেমন সাহসী তেমনি যোদ্ধা। অনেকের পেশাই ছিল যুদ্ধ করা। সাহসী গোরো-বে-ডিক্কোও জোয়ান বয়সে এক সেনাপতির অধীনে যুদ্ধ করত। একদিন ঠিক সন্ধ্যার মুখে সে তার দলের সব সৈন্যদের সঙ্গে এক গ্রামের কুয়োর কাছে এসে উপস্থিত হল। সেই কুয়োর পাশে পরমা রূপবতী এক ফুলানি মেয়ে দাঁড়িয়েছিল। মেয়েটিকে একা পেয়ে সেই সেনার দল তাকে বন্দী করে নিজেদের ছাউনিতে নিয়ে গেল। সেখানে তাদের সেনাপতি মেয়েটির রূপে মুগ্ধ হয়ে বলল যে, সে নিজেই মেয়েটিকে বিয়ে করবে। সেনাপতির আদেশে সৈন্যদের থেকে দূরে এক আলাদা তাঁবুতে মেয়েটির থাকার ব্যবস্থা করা হল।

সন্ধ্যা গড়িয়ে ক্রমশ রাত হয়ে গেল। সৈন্যরা সব যে যার তাঁবুতে শুয়ে পড়ল। কিন্তু কেউই মেয়েটির রূপের কথা ভুলতে পারছিল না। গোরো-বে-ডিক্কোর তো ঘুমই এলো না। প্রথম থেকেই

মেয়েটার ওপর তার কেমন একটা মায়া পড়ে গিয়েছিল। সেনাপতির নিষেধ থাকা সত্ত্বেও গভীর রাতে সে নিজের জীবন বিপন্ন করে মেয়েটিকে উদ্ধার করার জন্য বেরিয়ে পড়ল। চুপি চুপি সে তার তাঁবুর কাছে এল এবং তাকে নিজের ঘোড়ার পিঠে তুলে নিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। রাতের অন্ধকারে তারা দুজনে এসে পৌঁছে গেল সেই কুয়োটার পাশে। গোরো-বে-ডিক্কো মেয়েটিকে ঘোড়া থেকে নামিয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'এই কুয়োটা চিনতে পারছ?'

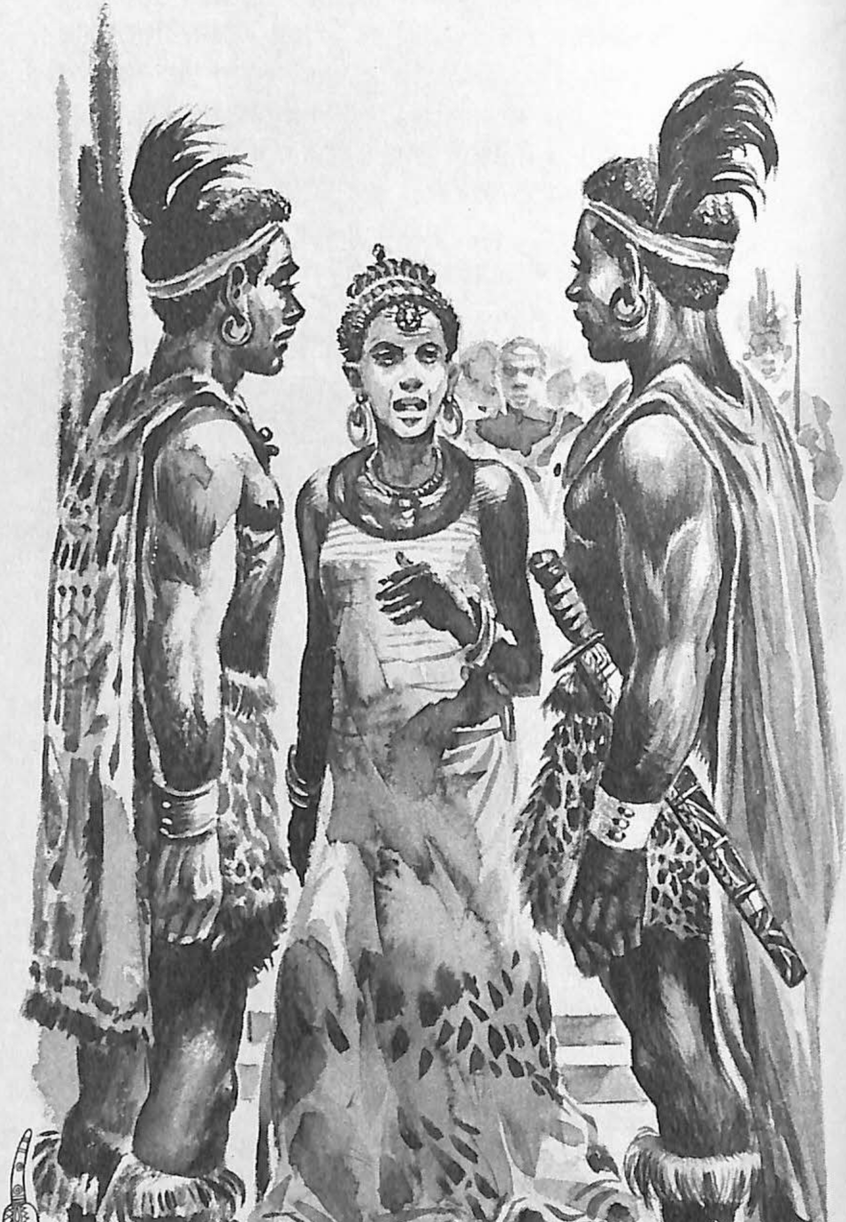
ভয়ে ভয়ে, ভাঙা ভাঙা গলায় মেয়েটি বলল, 'হ্যাঁ, এটা আমাদের গাঁয়েরই কুয়ো।'

সেনাপতির আদেশ অমান্য করে মেয়েটিকে উদ্ধার করার জন্য গোরো-বে-ডিক্কোর মন খুবই অশান্ত ছিল। তবুও সে নিজেকে সংযত করে ধীর কণ্ঠে বলল, 'তুমি মুক্ত, তুমি বাড়ি ফিরে যাও।'



এই ঘটনার পর অনেকদিন কেটে গেল, কতদিকে কত কি ঘটে গেল। গোরো-বে-ডিক্কো কিন্তু সেই ফুলানি মেয়েটির কথা ভুলতে পারেনি। সে খবর পেয়েছিল যে মেয়েটির সঙ্গে এক নামকরা যোদ্ধার বিয়ে হয়ে গেছে। তবুও সে মেয়েটির কথা মন থেকে মুছে ফেলতে পারছিল না। মেয়েটির চিন্তাতেই সে দিন দিন দুর্বল হয়ে পড়ছিল, তার মন থেকে আশা-আকাঙ্ক্ষা সবই যেন নিভে যাচ্ছিল। ক্রমশ সে অসুস্থ হয়ে পড়ল। তখন এর একটা প্রতিকার করার জন্য সে দৈবজ্ঞর কাছে উপস্থিত হল। দৈবজ্ঞ তাকে দেখে বললেন, 'শোন, আমি তোমার অসুখের কারণ বুঝেছি। এক রাতে তুমি এক পরমা রূপবতী কন্যাকে তোমার ঘোড়ায় চড়িয়ে কোথাও নিয়ে গিয়েছিলে। সেই সুন্দরী কন্যার চিন্তা তোমাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। সেই কন্যাকে বিয়ে করলেই তোমার এ অসুখ সেরে যাবে; না হলে এই মনোবেদনাতে তোমার মৃত্যু হবে।'

দৈবজ্ঞের এই কথা শুনে গোরো-বে-ডিক্কো একদিন সেই ফুলানি মেয়েটার সন্ধানে বেরিয়ে পড়ল। সেই কুয়োর কাছে পৌঁছে তার



বাড়ি খুঁজে পেতে অসুবিধা হল না : একজনকে জিজ্ঞাসা করতেই সে ফুলানি মেয়ের বাড়ি দেখিয়ে দিল। সেখানে গিয়ে সে দেখল এক যোদ্ধা তার অনুচরবর্গের সঙ্গে গল্প করছে। গোরো-বে-ডিক্কো ঘোড়া থেকে নেমে তাকে অভিবাদন জানাল ; সেও তার নবাগত অতিথিকে যথাযথ সম্মানের সঙ্গে অভ্যর্থনা করল। ভৃত্য এসে গোরো-বে-ডিক্কোর ঘোড়াটা তদারকের জন্য নিয়ে গেল। সব অনুচরবর্গ চলে যাবার পর সেই যোদ্ধাকে একা পেয়ে গোরো-বে-ডিক্কো বলল, 'এক সন্ধ্যাবেলা আপনাদের গ্রামের কুয়োর ধার থেকে আমাদের সৈন্যরা এক পরমাসুন্দরী মেয়েকে বন্দী করে তাঁবুতে নিয়ে গিয়েছিল। মেয়েটির রূপে মুগ্ধ হয়ে আমাদের সেনাপতি তাকে বিয়ে করার মতলব করল। মেয়েটির এই বিপদ দেখে, সেই রাতেই নিজের জীবন বিপন্ন করে আমি তাকে তাঁবু থেকে উদ্ধার করে তার গ্রামের কুয়োর পার্শ্বে পৌঁছে দিয়ে তাকে সেই বিপদ থেকে উদ্ধার করেছিলাম। সেদিন থেকেই মেয়েটির প্রতি এক গভীর মমতায় আমার মন ভরে আছে। আমি শেষ পর্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়ি। অসুস্থতার থেকে বাঁচবার জন্য এক দৈবজ্ঞের কাছে গিয়েছিলাম। তিনি বললেন যে সেই মেয়েটিকে বিয়ে না করা পর্যন্ত আমার এ অসুখ সারবে না, এবং এই মনোবেদনাতে আমার মৃত্যু হবে।'

সেই যোদ্ধাই ছিল ফুলানি মেয়ের স্বামী। সে তার অতিথির কথা খুব ধৈর্য ধরে শুনল। এক সময় তার স্ত্রীকে ভীষণ বিপদ থেকে উদ্ধার করার জন্য সে গোরো-বে-ডিক্কোর কাছে নিজেকে কৃতজ্ঞ মনে করল, এবং আজ তার বিপদে কীভাবে সাহায্য করতে পারে সেই চিন্তা করতে লাগল। কিছুক্ষণ চিন্তা করে সে গোরো-বে-ডিক্কোকে বলল, 'আপনি সেই মেয়েটিকে দেখলে চিনতে পারবেন ?'

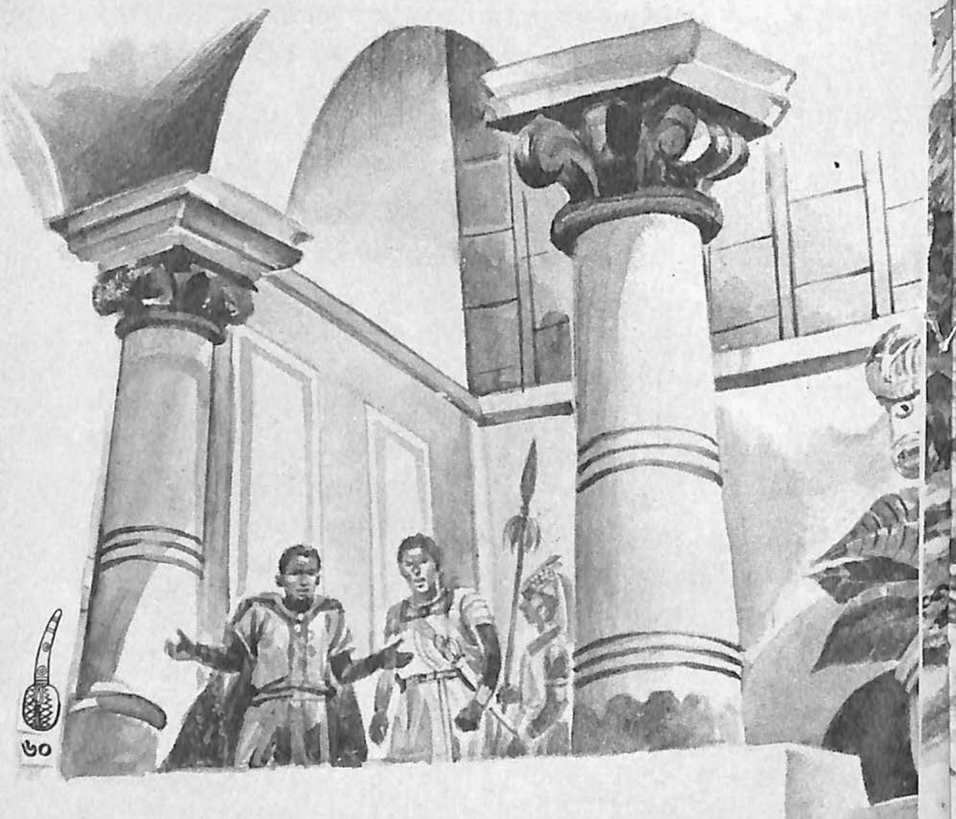
গোরো-বে-ডিক্কো বলল যে সে পারবে। তখন সেই যোদ্ধা বলল, তাহলে শুনুন, সেই মেয়েটি এখন আমারই স্ত্রী। তবুও, আমি তার সঙ্গে আপনার সাক্ষাতের ব্যবস্থা করছি। এই সাক্ষাতের ফলে আপনার রোগের উপশম হবে। আজ সন্ধ্যাবেলা তার বাড়িতে আমার নিমন্ত্রণ আছে। আপনি আমার পোশাক পরে আমার ছদ্মবেশে সেখানে যেতে পারেন। রাতে সেখানেই আহার করবেন। আহারের সময় তিনি আপনাকে অনেক রকম রান্না খেতে দেবেন। আপনি কিন্তু প্রত্যেকটি থেকে দু-গ্রাসের বেশি মুখে তুলবেন না, যা আমি করে থাকি। আজ রাতটা আপনি সেখানেই কাটাবেন এবং তার সঙ্গে সদালাপ করবেন। কিন্তু সব সময় এমন ব্যবহার করবেন

যাতে সে বুঝতে না পারে যে আপনি অন্য লোক।'

সেই যোদ্ধার ছদ্মবেশে সেখানে গিয়ে গোরো-বে-ডিক্কো কুয়োর পাশের সেই পরমা-রূপবতী ফুলানি মেয়েটির দেখা পেল, যে মেয়ের জন্যই তার যত অসুখ। সেখানে সে প্রাণভরে মেয়েটির সঙ্গে গল্প করল। কিন্তু রাতে আহারের পরই, সেই ফুলানি মেয়ের সব অনুরোধ উপেক্ষা করে, তার বাড়ি থেকে চলে গেল। মেয়েটি গোরো-বে-ডিক্কোকে তার স্বামী মনে করেই আপ্যায়ন করেছিল, এবং যত্ন করে খাওয়াল। এখন সে তার অনুরোধ উপেক্ষা করে চলে যাওয়ার জন্য সে তার স্বামীর ওপরই অভিমানে মুখ ভার করে রইল।

ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতেই গোরো-বে-ডিক্কো সেই যোদ্ধার সঙ্গে দেখা করল। তাকে দেখে যোদ্ধা জিজ্ঞাসা করল, 'আপনার অনেকদিনের বাসনা পূর্ণ হয়েছে তো?'

গোরো-বে-ডিক্কো বলল, 'খুব! যা চেয়েছিলাম, তার থেকে



অনেক বেশি আনন্দ পেয়েছি।'

সেই যোদ্ধা গোরো-বে-ডিক্কোর সঙ্গে খুব বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার করে তাকে বিদায় জানাল। গোরো-বে-ডিক্কোও নিজের গ্রামে ফিরে গেল।

পরের দিন যখন সেই যোদ্ধা তার স্ত্রীর বাড়িতে গেল, তার স্ত্রী আগের রাতে তার অনুরোধ উপেক্ষা করে চলে যাওয়ার জন্য তাকে তীব্র ভর্ৎসনা করল। যোদ্ধা তার স্ত্রীর এই ব্যবহারে প্রথমে খুব আশ্চর্য হয়েছিল, পরে বুঝল যে ভদ্র যুবক গোরো-বে-ডিক্কো রাতের আহার শেষ করেই ফুলানি মেয়ের বাড়ি থেকে চলে গিয়েছিল।

গোরো-বে-ডিক্কো গ্রামে ফিরে অন্য একটি মেয়েকে বিয়ে করে সুখে ঘর-সংসার করতে লাগল। কিছুদিন বাদে তাদের শুকতারার মত ঝলমলে সুন্দর এক ছেলে হল। সেই ছেলের যে দিন ধর্মে দীক্ষা আর নামকরণ উপলক্ষে গ্রামবাসীদের নিয়ে খুব আনন্দ-উৎসব চলছিল, সেই সময় একদল অশ্বারোহী হৈ-হৈ- রৈ-রৈ করতে করতে গোরো-বে-ডিক্কোর বাড়িতে এসে উপস্থিত হল। গোরো-বে-ডিক্কো



তাদের সেনাপতিকে দেখেই চিনতে পেরেছিল যে সে সেই কুয়োর পাশের পরমা-সুন্দরী ফুলানি মেয়ের স্বামী, সেই যোদ্ধা। সে তখনি ভৃত্যদের আদেশ করল অতিথিদের ঘোড়াগুলোর তদারক করার জন্য। তাদের সম্মানে বিরাট ভোজেরও আয়োজন করা হল।

ভূরিভোজনের পর তার অনুচরবর্গ যখন বাড়ি থেকে চলে গেল, ফুলানি মেয়ের স্বামী কোন ভণিতা না করেই তার এই আসার উদ্দেশ্য বলতে শুরু করল। সে বলল, 'একটি গুরুতর ব্যাপার নিয়ে আজ আপনার কাছে এসেছি। আমার স্ত্রী অসুস্থ, মৃত্যু তার শিয়রে অপেক্ষা করছে। দৈবজ্ঞদের পরামর্শ চাইতে তারা সকলেই বলল যে একমাত্র আপনার পুত্রের রক্তই আমার স্ত্রীকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে পারে। সেইজন্য আমি আপনার পুত্রকে নিতে এসেছি।'

গোরো-বে-ডিক্কো বলল, 'আপনি দয়া করে একটু অপেক্ষা করুন, আমি এখনি আসছি।' এই কথা বলে সে বাড়ির ভিতর গিয়ে তার



স্ত্রীকে এই মর্মান্তিক সংবাদ শোনাল। তার স্ত্রী বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে বলল, 'তুমি তো তাকে ফিরিয়ে দিতে পার না। তিনি গভীর বিশ্বাস নিয়ে তোমার কাছে এসেছেন। আমাদের ছেলেকে তার হাতে তুলে দাও ; তার রক্ত দিয়ে তিনি তার স্ত্রীর জীবন রক্ষা করুন।'

গ্রামবাসীদের বিস্ময়ে হতবাক্ করে দিয়ে সেদিনের সেই নামকরণ উৎসব বন্ধ হয়ে গেল। গোরো-বে-ডিক্কো তার ছেলেকে এনে যোদ্ধার এক ভৃত্যের হাতে তুলে দিল। সেই ছেলেকে নিয়ে যোদ্ধা চলে গেল।

আসলে যোদ্ধা একটা ভেড়া সঙ্গে এনে গ্রামের বাইরে বেঁধে রেখে এসেছিল। তারা গ্রাম থেকে বেরিয়ে এসে ভেড়াটাকে কেটে তার রক্তে সেই ছেলের পোশাক ভিজিয়ে, রক্তমাখা পোশাক এক ভৃত্যের হাত দিয়ে গোরো-বে-ডিক্কোর কাছে পাঠিয়ে দিল। মনিবের নির্দেশ মত সেই ভৃত্য এসে গোরো-বে-ডিক্কোকে বলল, 'এগুলো আপনার

ছেলের রক্তমাখা জামা। তাকে হত্যা করে প্রয়োজনীয় রক্ত নেওয়া হয়েছে। আমার মনিব আপনাকে অনেক ধন্যবাদ জানিয়েছেন।'

ভৃত্য ফিরে এসে সবার অলক্ষ্যে সেই ছেলেকে নিয়ে তার মনিবের গ্রামে চলে গেল, এবং সেখানে সেই ফুলানি মেয়ের হাতে ছেলেটিকে পৌঁছে দিল।

গোরো-বে-ডিক্কোর স্ত্রীর প্রায় এক সঙ্গেই সেই ফুলানি মেয়েরও একটি ছেলে হয়েছিল। তার কাছে এখন দুটি ছেলেই মানুষ হতে লাগল—তারা যেন দুটি যমজ ভাই। মাতৃস্নেহেরও কোন তারতম্য হল না। তারা দুজনে এক সঙ্গে বড় হয়ে উঠল। যুদ্ধেও যেত এক সঙ্গে। তাদের দুজনের বীরত্বের খ্যাতি দেশদেশান্তরে ছড়িয়ে পড়ল। সবাই এই দুই যোদ্ধাকে ভয় করত। যোদ্ধা হিসেবে তাদের নামডাক এতই হয়েছিল যে সবাই কেবল তাদের কথাই বলাবলি করত।



একদিন সেই ফুলানি মেয়ের স্বামী দুই ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে গোরো-বে-ডিক্কোর গ্রামে এল। দৈবক্রমে ছেলেদুটিকে প্রায় একই রকম দেখতে হয়েছিল—তাদের যমজ ভাই বললেও অবিশ্বাস করার কিছু ছিল না। ফুলানি মেয়ের স্বামী দলবল নিয়ে গ্রামের মধ্যে আসতেই গোরো-বে-ডিক্কোর অনুচরবর্গ তাদের চিনতে পারল, এবং আগের বারে তারা এসে কী সর্বনাশ করে গিয়েছিল সে কথাও তাদের মনে পড়ল। তখন তারা খুব হৈ-চৈ শুরু করে দিল ; বলল, 'প্রথমবার এসে গোরো-বে-ডিক্কোর ছেলেকে নিয়ে গিয়ে, তাকে বলি দিয়ে সেই রক্তে আপনার স্ত্রীর প্রাণ বাঁচিয়েছেন। আজ আবার নতুন কী সর্বনাশের মতলব নিয়ে আসা হয়েছে?'

গোরো-বে-ডিক্কো তার অনুচরবৃন্দকে শান্ত করে, তার এক ভৃত্যকে আদেশ করল অতিথিদের ঘোড়াগুলোর তদারক করার জন্য। গতবারের মত এবারেও অতিথিদের সম্মানে বিরাট ভোজের আয়োজন করা হল। গোরো-বে-ডিক্কো এবারে তার এই বন্ধুর সঙ্গে প্রথমবারের থেকেও আন্তরিক ব্যবহার করল,—অনেকদিন পরে তার বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়ে সে খুব আনন্দ প্রকাশ করতে লাগল।

ফুলানি মেয়েটির স্বামী কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেবার পর গোরো-বে-ডিক্কো আর তার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে চাইল। তারা দুজন যখন সেখানে উপস্থিত হল, তখন সে সমস্ত গ্রামবাসীর সামনে গোরো-বে-ডিক্কোর স্ত্রীকে বলল, 'আপনার সেই ছেলেকে আমি হত্যা করিনি। আমি কেবলমাত্র আপনাকে এবং আপনার স্বামীকে পরীক্ষা করে দেখেছিলাম। আপনার ছেলের সেই পোশাকে যে রক্ত দেখেছিলেন, সেটা ছিল ভেড়ার রক্ত। আপনারা যে সাহসী ও পরোপকারী তার যথেষ্ট প্রমাণ দিয়েছেন। এখন বলতে পারেন এই দুই যুবকের মধ্যে আপনার ছেলে কোনটি ?'

গোরো-বে-ডিক্কোর স্ত্রী বলল, 'আমার সে ছেলে যেখানেই থাকুক, আমি তাকে চিনতে পারবই। তার ডান উরুর ওপর একটা কাটা দাগ আছে।

তখন দুই যুবকের মধ্যে একটিকে এনে তার উরু পরীক্ষা করা হল, কিন্তু কোন কাটা দাগ দেখা গেল না। এই ছেলেটি ছিল কুয়োর পাশের সেই ফুলানি মেয়ের, যে মেয়েকে গোরো-বে-ডিক্কো বন্দী অবস্থা থেকে মুক্ত করেছিল। তখন দ্বিতীয় যুবককে আনা হল। গ্রামবাসীরা সব দুরু দুরু বক্ষে অপেক্ষা করছিল। দ্বিতীয় যুবকের ডান উরু পরীক্ষা করতে সেই কাটা দাগ দেখা গেল।

উরুতে কাটা দাগ দেখেই গোরো-বে-ডিক্কোর স্ত্রী উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, 'এই তো আমার ছেলে।' তখন বিস্ময়-বিমূঢ় গ্রামবাসীদের সামনে মা আনন্দের আবেগে ছেলের কাঁধে মাথা রেখে তাকে সস্নেহে জড়িয়ে ধরল।

গোরো-বে-ডিক্কোর হারানো ছেলে ফিরে এসেছে দেখে গ্রামবাসীরা আবার আনন্দে মেতে উঠল। চারিদিকে উৎসবের সাড়া পড়ে গেল, ঠিক যেমনটি শুরু হয়েছিল ঐ ছেলেরই ধর্মে দীক্ষা ও নামকরণের দিন।

(আফ্রিকার ফুলানি জাতের মধ্যে প্রচলিত কাহিনী)





বাগ্মী কৃষক

(এক রাজকর্মচারী পথে এক কৃষকের সর্বস্ব কেড়ে নিয়েছিল। তখন সেই কৃষক রাজদরবারে উপস্থিত হয়ে কী সাহসের সঙ্গে তীব্রভাবে উচ্চপদস্থ রাজপুরুষদের কাজের সমালোচনা করেছিল, এবং শেষ পর্যন্ত সুবিচার পেয়েছিল, এটা তারই গল্প)।

অনেক অনেক বছর আগেকার কথা,—এখনকার মত তখনও আফ্রিকার উত্তর অঞ্চলটা ছিল মরুভূমির দেশ, আর তার মাঝে মাঝে ছিল মরূদ্যান। এমনি এক মরূদ্যানের কাছে খুনানুপ নামে এক কৃষক তার বউ মারী আর তাদের ছেলেমেয়েদের নিয়ে বসবাস করত। একদিন খুনানুপ তার বউকে ডেকে বলল, 'শোন, আমি ছেলেমেয়েদের কাপড়-জামা কিনতে মিশর দেশে যাব। তুমি গোলাতে যা যব পড়ে আছে সব বার করে মেপে আমাকে বল।'

মারী গোলা থেকে যব বার করে মেপে দেখে তাকে জানাল যে

আট বস্তার মত যব পড়ে আছে। খুনানুপ তখন বেশ খানিকটা যব আলাদা করে রেখে বলল, এটা রইল তোমার আর ছেলে-মেয়েদের খাবার। বাকীটা দিয়ে আমার পথে খাবার জন্য রুটি আর পানীয় তৈরি করে দাও।'



নানা রকমের গাছ-গাছড়া, লবণ, ফারাকরা মরূদ্যানের কাঠ, চিতাবাঘের আর নেকড়ের ছাল, পায়রা, পাখি, নানারকমের দামী পাথর—মরূদ্যান ও তার আশেপাশের এই সব ভাল ভাল জিনিষ কয়েকটা গাধার পিঠে বোঝাই করে খুনানুপ একদিন মিশরের দিকে রওনা হয়ে গেল। দুটো দেশ পার হয়ে সে মেদেনি রাজ্যের উত্তর দিকে এসে পৌঁছাল। সেখানে পৌঁছে দেখল নদীর ধারে ইস্‌রির ছেলে জেহুতিনেখৎ দাঁড়িয়ে আছে। জেহুতিনেখৎ ছিল মারুর পুত্র সে-রাজ্যের প্রধান শাসনকর্তা রেনসির প্রজা, ও তার অধীনেই এক রাজকর্মচারী। পিঠে মালপত্র বোঝাই গাধাগুলো দেখে তার খুব লোভ হল। কী করে এই মরূদ্যানবাসীর সব কিছু কেড়ে নেওয়া যায়, সে মনে মনে তারই ফন্দি আঁটতে লাগল।

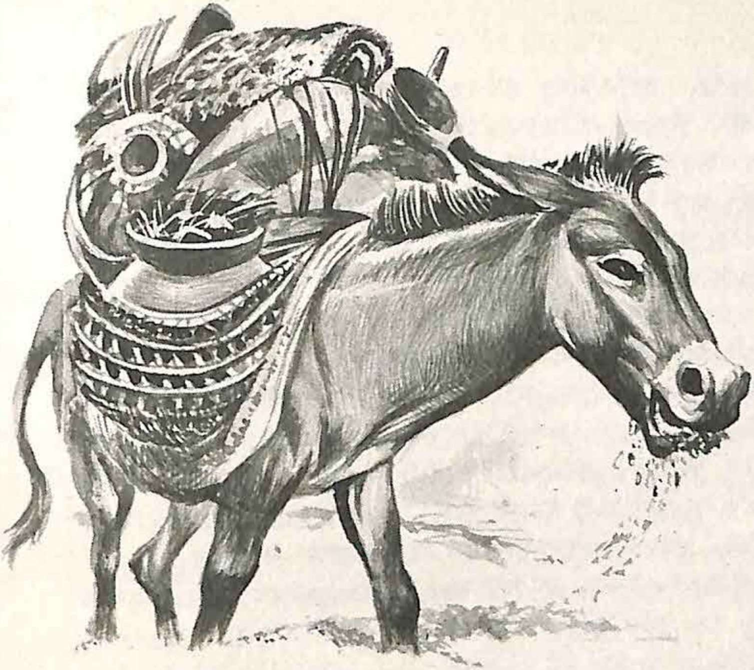
জেহুতিনেখতের বাড়িটা ছিল পথের ধারেই। পথটাও ছিল সরু। তার একপাশে জমেছিল জল, অন্যপাশটায় যব শুকচ্ছিল। জেহুতিনেখৎ তার ভৃত্যকে বলল, 'যা, ছুটে বাড়ি থেকে একটা কাপড় নিয়ে আয়।' ভৃত্য কাপড়টা আনতে, সে নদীর ধার থেকে যবের কাছ পর্যন্ত পথের ওপর কাপড়টা বিছিয়ে দিল।

সাধারণের যাতায়তের সেই পথ ধরে খুনানুপ যখন কাছাকাছি এসে পড়ল, জেহুতিনেখৎ তাকে বলল, 'আরে থাম থাম। তুমি আমার কাপড়টা মাড়িয়ে যাবে না কি?'

খুনানুপ বলল, 'আপনি যেমন বলবেন আমি সে রকমই কাজ করব। তবে আমি জানি আমি ঠিক পথ ধরেই চলেছি।' এই কথা বলে সে পথের যেদিকে যব শুকোচ্ছিল সে দিক দিয়ে যাবার জন্য এগিয়ে গেল।



 জেহুতিনেখৎ তখন বলল, 'ওহে মরূদ্যানবাসী, তুমি যবের ওপর



দিয়ে রাস্তা করবে না কি ?'

খুনানুপ বলল, 'আমি ঠিক পথেই চলেছি। নদীর দিকে গভীর খাদ, পথের এদিকে যব শুকতে দিয়েছেন, আর বাকী পথটা কাপড় বিছিয়ে বন্ধ করে দিলেন। আপনি কি চান এখানেই আমি পথ চলা বন্ধ করে দি ?'

খুনানুপের কথাটা শেষ হয়েছে কি না হয়েছে, একটা গাধা পথ থেকে এক মুখ যব তুলে চিবুতে শুরু করে দিল। জেহুতিনেখতের তখন আর ছলের অভাব রইল না। সে বলল, 'দেখ হে, তোমার গাধার কাণ্ডটা দেখ ! যেমন আমার যব খেয়েছে, আমি ওকে ছাড়ছি না। শাস্তি হিসেবে ওকে দিয়েই আমার সব যব মাড়ানোর কাজটা করিয়ে নেব।'

খুনানুপ বলল, 'আমি ঠিক পথ দিয়েই চলেছি। পথের ওপাশ দিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়, সেই জন্যই পথের এপাশ দিয়ে আমি গাধাগুলোকে নিয়ে যাচ্ছিলাম। আর, একটা গাধা না হয় একটু যবই মুখে পুরেছে। সেই অপরাধে আপনি তাকে আটক করবেন ! এই সব জমির কে মালিক আমি জানি। তিনি হচ্ছেন মারুর পুত্র, এ রাজ্যের প্রধান শাসনকর্তা রেনসি। যে রেনসি এ রাজ্যের সব চোরদের শাস্তি দিয়ে থাকেন, তারই জমির ওপর আমার জিনিষ লুঠ হবে ?'

তখন জেহুতিনেখৎ তাচ্ছিল্যভরে বলল, 'তুই কোথাকার এক রেনসির কথা শোনাচ্ছিস্ ? তোর সঙ্গে এখন যে কথা বলছে, সেই ত এখানকার সব কিছুর মালিক। এই কথা বলে সে একটা ঝাউকাঠের লাঠি এনে খুনানুপকে খুব মার দিল, আর মালপত্র বোঝাই গাধাগুলোকে ধরে নিজের বাড়ির মধ্যে পুরে দিল। তখন সর্বস্ব হারিয়ে খুনানুপ সেখানে বসে মনের দুঃখে কান্না শুরু করল।

জেহুতিনেখৎ তাকে বলল, 'তুই চুপ কর। ভারী এক মরূদ্যান থেকে এসেছিস্! একদম চেঁচাবি না। তোকে একেবারে চুপ করিয়ে দেবার ওষুধও আমি জানি।'

খুনানুপ বলল, 'আপনি আমাকে প্রহার করলেন, আমার সর্বস্ব কেড়ে নিলেন। এখন বিলাপ করার অধিকার থেকেও আমাকে বঞ্চিত করতে চান ? আমার যে সব জিনিষ নিয়েছেন, ফিরিয়ে দিন ; আমিও বিলাপ করে আপনাকে আর বিরক্ত করব না।'

খুনানুপ এইভাবে দশ দিন ধরে জেহুতিনেখতকে মিনতি করল। কিন্তু সে তার কথায় কানই দিল না।



জেহুতিনেখতের কাছে সর্বস্ব হারিয়ে খুনানুপ সে রাজ্যের প্রধান শাসনকর্তা রেনসির দরবারে গিয়ে হাজির হল। সে অভিযোগ করে বলল, 'প্রভু, আপনার যে রাজ্য সব থেকে সুশাসিত বলে পরিচিত, সেই রাজ্যে আমার কী দুর্ভোগ হয়েছে সে কথা আপনাকে জানাতে এসেছি। আপনি প্রাজ্ঞ, আপনি অপহরণকে ঘৃণার চোখে দেখেন ; আপনি মহান, আপনি সর্বপ্রকার নীচবৃত্তি থেকে দূরে থাকেন। আপনি মিথ্যাকে বিনাশ করে সত্যের প্রতিষ্ঠা করেন ; আমি আপনার কাছে মিনতি করছি, আপনি শ্রবণ করুন, দুষ্কর্মকে দমন করুন। হে মানবশ্রেষ্ঠ ! আপনি সুবিচার করুন, আমার মনোকষ্টের অবসান করুন। দুঃখে আমার মন ভেঙে পড়েছে। আমার সর্বস্ব অপহৃত হয়েছে। আপনি তার প্রতিবিধান করুন।'

মরূদ্যানবাসী কৃষকের এই বাগ্মিতায় মুগ্ধ হয়ে প্রধান শাসনকর্তা রেনসি সেই রাজ্যের রাজা নেবকাউরের কাছে গিয়ে বললেন,

'মহারাজ, মরূদ্যান থেকে এক কৃষক এসেছে, সে যথার্থই একজন সুবক্তা। আমার এক কর্মচারী পথে এই কৃষকের সর্বস্ব অপহরণ করে নিয়েছে। তারই প্রতিকারের জন্য আমার দরবারে এসে সে প্রার্থনা জানাচ্ছিল।'

রাজা বললেন, 'এই কৃষকের কথার এখনই কোন জবাব দিও না। তাকে নিজের খেয়াল খুশিমত কথা বলে যেতে দাও ; তুমি কোন কথাই বল না। আর একজন লিপিকর নিযুক্ত করে তার সব কথা লিপিবদ্ধ করে আমাকে দিও। যতদিন কৃষকটি এখানে থাকবে, তার ভাল থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা কর ; তবে তুমিই যে তার সব স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করেছ সে যেন ঘুণাক্ষরেও না জানতে পারে। আর একটা কথা—আমি জানি এই সব মরূদ্যানবাসীদের স্বভাব হচ্ছে তাদের বাড়ির মজুত খাদ্য শেষ না হওয়া পর্যন্ত তারা কেউ মিশরের পথে পা বাড়ায় না। তাই, এই কৃষকের পরিবারবর্গের সংবাদ নিয়ে তাদেরও যাতে কোন অসুবিধা না হয় তার ব্যবস্থা করবে।'

রাজার আদেশ অনুযায়ী রেনসি তার এক বন্ধু মারফৎ খুনানুপকে রোজ দশখানা রুটি ও দু'কলসী উৎকৃষ্ট পানীয় পাঠাতে শুরু করল ; এবং সেই মরূদ্যান অঞ্চলের শাসনকর্তাকে নির্দেশ দিল খুনানুপের পরিবারবর্গের খবরাখবর নিয়ে তাদেরও রোজ প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য পাঠাবার ব্যবস্থা করতে।

খুনানুপ রেনসির দরবারে দ্বিতীয় দিন তার প্রার্থনা শুরু করল, বলল, 'হে মহামহিম, হে প্রভু, উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীরা দুষ্কর্মে লিপ্ত হয়েছে। ন্যায় ও নিষ্ঠার বিলুপ্তি ঘটেছে। বিচারকেরাই চৌর্যবৃত্তি অবলম্বন করেছে। যে প্রতারকদের কারারুদ্ধ করবে, সে নিজেই ন্যায়ের পথ পরিত্যাগ করে প্রতারণার কাজে যোগ দিয়েছে ! দেশের যে আইন-রক্ষক সে নিজেই এক তস্কর। রাজ্যে দারিদ্র্যের অবসান ঘটান যার দায়িত্ব, সে নিজেই আকালের সৃষ্টি করে জনপদগুলোকে ধ্বংস করছে। রাজ্যে অপকর্ম প্রতিরোধ করা যার কাজ, সে নিজেই অন্যায় অবিচার করে চলেছে।'

মারুর পুত্র প্রধান শাসনকর্তা রেনসি বললেন, 'তোমার যে মালপত্র আমার কর্মচারী অপহরণ করেছে, তার থেকে তোমার জীবনের দাম কি বেশি নয় ?'

মরূদ্যানবাসী রেনসির এই প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়ে নিজের কথাই বলে চলল, 'ব্যবসায়ীরা অধিক লাভের জন্য শস্য ওজনের সময় ক্রেতাকে প্রতারণা করছে ; লোকে নিজের গোলায় শস্য রাখছে



চোরের জন্য। আইনের রক্ষক চৌর্যবৃত্তিকে প্রশ্রয় দিচ্ছে। অবিচার প্রতিরোধ করা যার কাজ সে নিজে যদি কর্তব্যে অবহেলা করে, অবিচারকে উৎসাহ দান করে, তবে রাজ্যে দুষ্কর্ম প্রতিরোধ করবে কে ? কয়েকজনকে আপাতদৃষ্টিতে সজ্জন বলে মনে হলেও, তারা গোপনে অসৎ পথে চলেছে ; আর কিছু লোক তো প্রকাশ্যভাবেই দুষ্কর্মের দিকে ঝুঁকেছে। এদের সকলের কী উচ্চ রাজপদ শোভা পায় !

'ভাগ্যবান লোক সহানুভূতিশীল হতে পারে। দুষ্কর্মকারীরা সাধারণত হিংস্র স্বভাবের হয়ে থাকে। অভাবগ্রস্ত লোকের পক্ষে চুরি

করা যেমন স্বাভাবিক, একজন দুষ্কৃতকারীর পক্ষে অপরের সম্পত্তি হরণ করাও তেমনি স্বাভাবিক। যার অভাব নেই, চুরি করা তার পক্ষে জঘন্যতম অপরাধ। অভাবের তাড়নায় যে চুরি করে, সে তো নিজে বাঁচবার জন্য চুরি করছে। কিন্তু আপনারা ?—আপনাদের রুটিরও অভাব নেই, মূল্যবান পানীয়েরও অভাব নেই।'

তৃতীয় দিনে সেই মরূদ্যানবাসী তার প্রার্থনায় বলল, 'হে মহামহিম, হে প্রভু, রাজ্য থেকে তস্করদের বিতাড়িত করে হতভাগ্যদের রক্ষা করুন। বিধ্বংসকারী বন্যার মত সব কিছু ধ্বংস করবেন না। পরকালের কথাও চিন্তা করা উচিত! "ন্যায়পরায়ণতাই জীবনের শ্রেষ্ঠ ধর্ম" এই প্রবাদবাক্যকে আশ্রয় করে দীর্ঘ জীবন যাপন করুন। যে শাস্তি পাবার যোগ্য তাকে শাস্তি দান করুন। দেখবেন ন্যায়পরায়ণতায় আপনার সমকক্ষ কেউ থাকবে না।

'আপনি সেই হতভাগ্য রজকের মত, যে লোভের বশবর্তী হয়ে সৎ বন্ধুর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছিল, খরিদ্দারকে সন্তুষ্ট করতে পরিচিত লোকদের ত্যাগ করেছিল। কেবল যাদের দ্বারা স্বার্থসিদ্ধি হত, তাদেরই "ভাই ভাই" বলে আপ্যায়ন করত।

'আপনি খেয়াঘাটের সেই মাঝির মত, যে কেবল অর্থের বিনিময়েই লোক পারাপার করত। আপনার মত এক কর্তব্যজ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তির সব বিচারবুদ্ধি যেন লোপ পেয়ে গেছে...

'মানুষের মধ্যে আপনি বাজপাখির মত, যে দুর্বল পাখিদের হত্যা করেই জীবনধারণ করে।

'আপনি সেই পাচকের মত, যে পশুপাখি নির্বিচারে হত্যা করে আনন্দ পায়, কিন্তু সেই অপকর্মের জন্য লোকনিন্দার ভয় করে না।'

কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে মরূদ্যানবাসী আবার বলতে শুরু করল, 'আমার অভিযোগ আপনার শোনা উচিত; কিন্তু আপনি তাতে কর্ণপাত করছেন না কেন ? আজ আমার বিদ্রোহী মনোভাবকে বিদায় দিয়েছি। কিন্তু দেখছি আপনার কাছে তার তো কোন মূল্যই নেই ! তবে, সত্যের মহিমা মিথ্যাকে দমন করে একদিন প্রকাশিত হবেই। আগামীকালকে অবজ্ঞা করা উচিত নয় ; কেউই বলতে পারে না সেই দিনটি কার কী অমঙ্গল আনতে পারে।'

মারুর পুত্র প্রধান শাসনকর্তা রেনসির দরবারের প্রবেশপথে বসেই মরূদ্যানবাসী এই সব অভিযোগ শুনিয়ে যাচ্ছিল। সে দিন রেনসির আদেশে দুজন সশস্ত্র প্রহরী মরূদ্যানবাসীকে বেত্রাঘাত করল। তখন



মরূদ্যানবাসী বলল, 'তাহলে বোঝা যাচ্ছে মারুর পুত্র রেনসি এখনও ভুল পথে চলেছেন। তিনি সব কিছুই অন্ধের দৃষ্টিতে দেখছেন, বধিরের কান দিয়ে শুনছেন। যে সব কথা তাকে বলা হল, তিনি তাতে কর্ণপাতই করলেন না।'

চতুর্থদিনে প্রধান শাসনকর্তা রেনসিকে দেবতা আরসেফেজের * মন্দির-দ্বার থেকে বেরিয়ে আসতে দেখে মরূদ্যানবাসী সেখানেই তাকে বলল, 'হে সম্মাননীয় ব্যক্তি, আপনি যে দেবতা আরসেফেজের মন্দির থেকে আসছেন, তিনি আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে

 * (প্রাচীন মিশরের এক দেবতা)

আশীর্বাদ করুন । যা সৎ সে তো বিনষ্ট হয়েইছে । এমন একজনকেও পাওয়া যাবে না যিনি দুষ্কর্মকে দমন করেছেন বলে আত্মগর্ব করতে পারেন ।'

পঞ্চম দিনে মরূদ্যানবাসী তার প্রার্থনা জানাতে এসে বলল, 'হে প্রধান শাসনকর্তা, হে প্রভু, গরীবকে তার সর্বস্ব থেকে প্রতারিত করবেন না । সেই সামান্য সম্পত্তিই তার শ্বাস-প্রশ্বাস । সেই সম্পত্তি হরণ করা মানে তাকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করা । আপনার দরবারের উচিত সব অভিযোগ শ্রবণ করা, নিরপেক্ষভাবে বিচার করা, এবং দোষীকে শাস্তি দেওয়া । কিন্তু আপনি চোরকে উৎসাহ দেওয়া ছাড়া আর তো কিছুই করছেন না ।'

ষষ্ঠদিনে মরূদ্যানবাসী এসে বলতে শুরু করল, 'তৃপ্তি সহকারে আহারে যেমন ক্ষুধার নিবৃত্তি হয়, বস্ত্র পরিধানে যেমন নগ্নতার পরিসমাপ্তি ঘটে, প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টির পর আকাশ মেঘশূন্য হলে রৌদ্রতাপে যেমন ধরণীর উষ্ণতা ফিরে আসে, অগ্নি যেমন রন্ধনে সাহায্য করে — হে মহামহিম, হে প্রভু, বিচারকের নিরপেক্ষ তদন্ত তেমনিভাবেই মিথ্যার প্রভাব বিনষ্ট করে সত্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে থাকে ; অমঙ্গলের অবসান ঘটিয়ে মঙ্গলের সূচনা করে ।'

সপ্তম দিনে তার প্রার্থনায় মরূদ্যানবাসী বলল, 'হে প্রধান শাসনকর্তা, এই সারা রাজ্যটা আপনার শাসনাধীন ; যেন একটি বড় জাহাজ আপনার নির্দেশেই চলছে । আপনি সেই 'টট্'* দেবতা, যিনি সর্বদাই নিরপেক্ষভাবে বিচার করেন । হে প্রভু, যখন একজন ন্যায় বিচারের প্রার্থনা নিয়ে আপনার দ্বারে উপস্থিত হয়েছে, আপনি তার প্রতি করুণা করুন···

'যিনি আইনের অবমাননা করেন, যিনি সকল নিয়ম লঙ্ঘন করেন, যিনি গরীবের সর্বস্ব হরণ করে তাকে মৃত্যুর পথে ঠেলে দেন, সুবিচার কখনও সেই লোককে উচ্চসম্মান দান করে না । এতক্ষণ মনে হচ্ছিল আমার দেহ ক্ষতবিক্ষত, মন দুঃখে ভরা ; সুবুদ্ধিও যেন আমার দেহ ও মনকে পরিত্যাগ করেছিল । বাঁধের ফাটল দিয়ে যেমন ক্রমাগত জল নির্গত হয়, তেমনি আমার মুখ থেকে ক্রমাগত বাক্য নিঃসৃত হচ্ছিল । এখন আমি নোঙ্গর ফেলেছি । বাঁধের জল নিঃশেষ করেছি, আমার সব গ্লানি উজাড় করে দিয়েছি, আমার মলিন বসন ধৌত

* (প্রাচীন মিশরের দেবতা । মুখ সারস পাখির মতো, লম্বা ঠোঁটওলা টটকে মিশরীয়রা জ্ঞানবিদ্যা যাদুবিদ্যা প্রভৃতির দেবতা বলে বিশ্বাস করতো ।)

করেছি। আমার যা বলার ছিল সবই বলেছি। আমার দুর্ভাগ্যের সকল কথা আপনার কাছে সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করেছি। আপনি আর কি প্রত্যাশা করেন ?'

মরূদ্যানবাসী অষ্টম দিনে এসে তার প্রার্থনায় বলল, 'হে প্রধান শাসনকর্তা, হে প্রভু, অতি লোভই মানুষের পতনের কারণ হয়। লোভী মানুষের মনোবাঞ্ছা কোন দিনই পূর্ণ হয় না, অকৃতকার্যতাই তার কাছে ফিরে ফিরে আসে। আপনিও লোভী, আপনারও মঙ্গল হবে না। আপনি অপহরণ করেন, কিন্তু আপনার লাভ কিছুই হয় না। আপনার কর্তব্য সকলকে উন্নতশিরে নিজ অধিকার রক্ষার



সুযোগ দেওয়া। জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় সব কিছুই তো আপনার গৃহে মজুত আছে। আপনার উদর পূর্ণ, আপনার শস্যের গোলা কানায় কানায় ভরা,—সামান্য স্পন্দনেই যা উপচে পড়বে—

'সুবিচার অনন্তকালের বস্তু। যে সুবিচারে অভ্যস্ত, তার স্মৃতিসৌধও চিরকাল তার সেই মহিমা বহন করে থাকে…

'হে প্রভু, আমি বা অন্য যে কেউ আসুক, আপনি সকলকেই স্বাগত জানাবেন। যার অভিযোগ করার অধিকার নেই, এমন লোকও প্রার্থনা জানাতে এলে, বাধা না দিয়ে তার বক্তব্য শ্রবণ করবেন। আক্রমণকারীকে ছাড়া কোন লোককে অযথা আক্রমণ করা থেকে বিরত থাকবেন।'

মরূদ্যানবাসী নবম দিনে তার প্রার্থনায় বলল, 'হে প্রধান শাসনকর্তা, হে প্রভু, জিহ্বাই মানুষের মানদণ্ড, জিহ্বাই মানুষের দৈন্য (মূর্খতা) প্রকাশ করে দেয়…

'আপনার কোনরূপ পক্ষপাতিত্ব করা, বা খেয়ালখুশি মত কাজ করা শোভা পায় না। আপনার পরিচিত ব্যক্তির কাছে নিজের প্রকৃত মনোভাব গোপন করবেন না। যাকে একবার অনুগ্রহ করেছেন, তাকে হতাশ করবেন না। কোন ব্যক্তি প্রার্থনা জানাতে এলে তাকে বিতাড়িত করবেন না…

'ন্যায় বিচারের প্রার্থনা নিয়ে কোন লোক উপস্থিত হলে, মনোযোগের সঙ্গে তার বক্তব্য শ্রবণ করুন। ন্যায় বিচারে বিরত ব্যক্তির কোন বন্ধু থাকে না। অর্থলিপ্সুরা অর্থের পিছনে ছুটেই জীবন শেষ করে, কোনদিন আনন্দের মুখ দর্শন করতে পায় না।

'হতভাগ্য লোকেরাই প্রার্থনা জানাতে আসে। তার বিপক্ষদল তার ঘাতক। দেখুন, আমি আপনার কাছে প্রার্থনা নিয়ে এসেছিলাম, কিন্তু আপনি আমার কথায় কর্ণপাতই করলেন না। এখন দেখছি দেবতা আনুবিসের* কাছে আপনার সম্বন্ধে প্রার্থনা জানাতে হবে। তিনিই আপনার পাপ-পুণ্যের বিচার করবেন।'

তখন মারুর পুত্র প্রধান শাসনকর্তা রেনসি দুজন প্রহরীকে নির্দেশ দিলেন সেই মরূদ্যানবাসীকে তার দিকে পিছন ফিরে দাঁড় করিয়ে দিতে। এই নির্দেশ শুনে মরূদ্যানবাসী খুব ভীত হয়েছিল ; ভেবেছিল রাজপুরুষদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করার জন্য এবার তার শাস্তি হবে।

* (প্রাচীন মিশরের দেবতা। প্রাচীন মিশরীয়রা বিশ্বাস করতো এই শিয়ালমুখো আনুবিস মৃতলোকের পাপ-পুণ্যের বিচার করে।)

মারুর পুত্র রেনসি মরূদ্যানবাসীর ভীতভাব দেখে বললেন, 'হে মরুদ্যানবাসী, তুমি ভয় পেয়ো না। তোমাকে এখানে বেশি দিন রাখার জন্যই তোমার সঙ্গে কিছু দুর্ব্যবহার করেছি।'

মরূদ্যানবাসী বলল, 'হায়! আমাকে কি আপনাদের রুটি ও পানীয় আরও কিছুদিন খেতে হবে?'

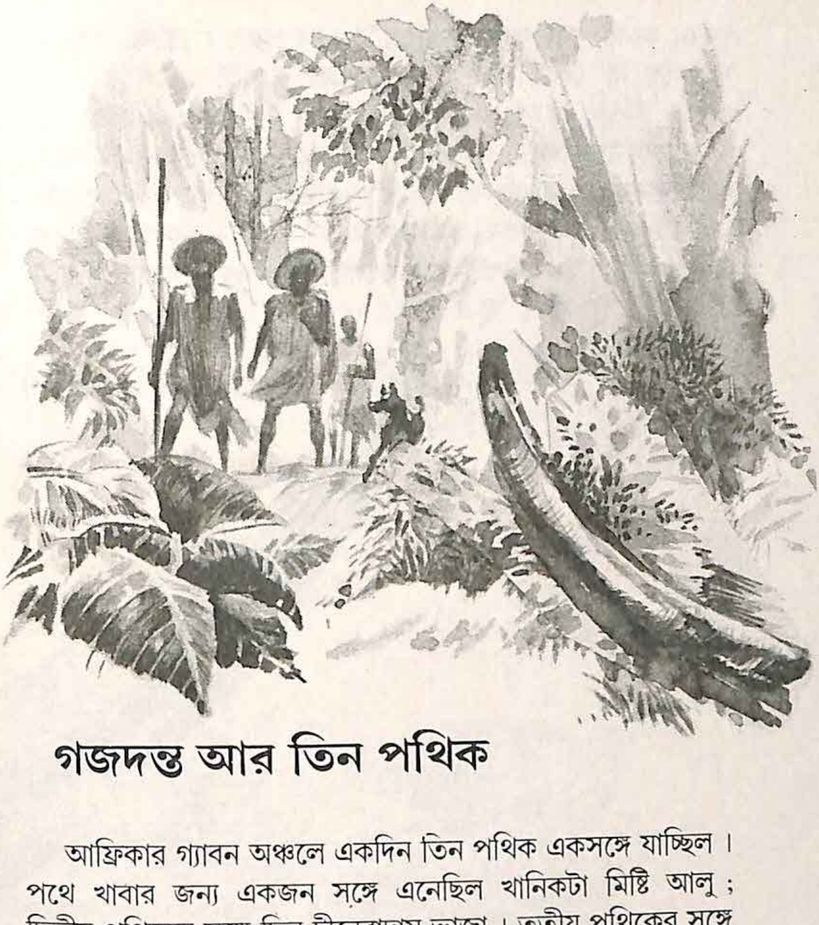
প্রধান শাসনকর্তা রেনসি বললেন, 'আর কিছুক্ষণ অপেক্ষা কর। তুমি গত কয়েকদিন ধরে যে সব প্রার্থনা জানিয়েছ, সেগুলো শোন।'

প্যাপিরাস পাতায় লেখা পাণ্ডুলিপি থেকে প্রার্থনাগুলো একটার পর একটা পড়ে মরূদ্যানবাসী কৃষক খুনানুপকে শোনান হল। পাঠ শেষ হলে রেনসি সেই পাণ্ডুলিপি রাজা নেবকাউরের হাতে দিলেন। রাজা সমস্ত দেখে খুব খুশি হয়ে বললেন, 'হে মারুর পুত্র রেনসি, তুমি নিজেই এই অভিযোগের নিষ্পত্তি কর।'

তখন মারুর পুত্র প্রধান শাসনকর্তা রেনসির নির্দেশে দুজন প্রহরী পাঠিয়ে জেহুতিনেখৎকে বন্দী করে আনা হল। জেহুতিনেখতের সমস্ত সম্পত্তি ও তার গৃহভৃত্যদের একটি তালিকা প্রস্তুত করা হল। চুরির অপরাধে জেহুতিনেখতের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে মরূদ্যানবাসী কৃষক খুনানুপকে দেওয়া হল, এবং জেহুতিনেখৎ ও তার ছ"জন গৃহভৃত্যকে বাকী জীবন খুনানুপের দাসত্ব করে কাটাতে হল।

(খৃঃ পূঃ প্রায় তিন হাজার বছর আগেকার একটি প্রাচীন মিশরীয় এই উপকথার পাণ্ডুলিপির শেষ অংশটা নষ্ট হয়ে গিয়েছে। তবে সকলেই মনে করেন খুনানুপের অভিযোগের নিষ্পত্তি উপরোক্তভাবেই হয়েছিল)।





গজদন্ত আর তিন পথিক

আফ্রিকার গ্যাবন অঞ্চলে একদিন তিন পথিক একসঙ্গে যাচ্ছিল। পথে খাবার জন্য একজন সঙ্গে এনেছিল খানিকটা মিষ্টি আলু ; দ্বিতীয় পথিকের সঙ্গে ছিল চীনেবাদাম ভাজা। তৃতীয় পথিকের সঙ্গে খাবার কিছুই ছিল না ; সঙ্গে ছিল তার নিজের কুকুরটা। গ্রাম পেরিয়ে তারা গভীর বনের মধ্যে একটা পথ দিয়ে যাচ্ছিল। তখন দুপুর গড়িয়ে এসেছে। অনেকক্ষণ পথ চলে তারা সকলেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল ; তাদের খিদেও পেয়েছিল খুব। পথের ধারে একটা গাছের মোটা গুঁড়ি পড়ে আছে দেখে, পথিক তিনজন তার ওপরই বসে পড়ল। প্রথম পথিক চারদিকে চোখ বুলিয়ে দেখল তার ঐ মিষ্টি আলুর সঙ্গে খাবার জন্য যদি কিছু পাওয়া যায়। দ্বিতীয় পথিকেরও রাগ হচ্ছিল—চীনেবাদাম ভাজার সঙ্গে খাবার জন্য আর কিছু নেই দেখে। তখন সে কয়েক মুঠো চীনেবাদাম দিয়ে প্রথম পথিকের কাছ থেকে একটা মিষ্টি আলু চেয়ে নিল। তারপর তারা

দুজনে মনের সুখে দুপুরের খাওয়াটা শেষ করল। তাদের একজন সঙ্গী যে না খেয়ে রইল সেটা গ্রাহ্যের মধ্যেই আনল না।

খাওয়া শেষ করে, যে পাতায় মুড়ে তারা নিজেদের মিষ্টি আলু আর চীনেবাদাম এনেছিল, সেই খালি পাতাগুলো পাশের বনে ছুঁড়ে ফেলে দিল। সেই দেখে, তৃতীয় পথিকের সঙ্গে যে কুকুরটা ছিল সে কিছু খাবার পাবার আশায় পাতাগুলোর পিছু পিছু বনের মধ্যে ছুটে



গেল। তারপর, বন থেকে কুকুরটার ফিরতে দেরী দেখে, তার মনিব বনের মধ্যে তার খোঁজ করতে গিয়ে দেখল যে কুকুরটা একটা হাতীর দাঁত চিবুচ্ছে। মনিব তো দেখেই তাড়াতাড়ি কুকুরের মুখ থেকে হাতীর দাঁতটা ছিনিয়ে নিল ; আর অমন একটা দামী জিনিষ পেয়ে তার খুব আনন্দও হচ্ছিল। কুকুর আর হাতীর দাঁত নিয়ে ফিরে এসে সে যখন তার সঙ্গী দুজনকে ঘটনাটা বলল, তখন প্রথম পথিক হাতীর দাঁতটা জোর করে কেড়ে নিতে গেল। সে বলল, 'আমি যদি খালি পাতাগুলো ঐ বনে না ফেলতাম, তোমার কুকুর তোসেখানে যেত না। সুতরাং এই হাতীর দাঁত আমার।'

তখন দ্বিতীয় পথিক বলল, 'খালি পাতা তুমি বনে ফেলেছ ঠিকই ; কিন্তু আমি যদি তোমাকে চীনেবাদাম না দিতাম, তাহলে তো

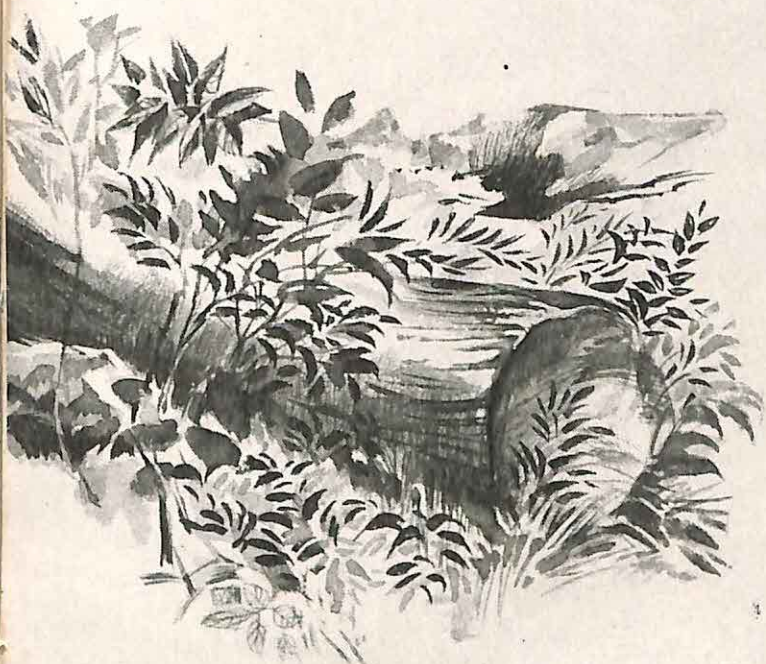
তোমার মিষ্টি আলু খাওয়াই হত না, আর তুমি খালি পাতাও ফেলতে না। সুতরাং হাতীর দাঁতটা আমার।'

আর তৃতীয় পথিক, কুকুরের যে মনিব, সে তো ভেবেই রেখেছে যে তার কুকুর যখন হাতীর দাঁতটা পেয়েছে, সেটা তারই সম্পত্তি।

সেদিন গজদন্তের মালিকানা নিয়ে তর্ক করতে করতে রাত্রি হয়ে গেল। তখন তিন পথিক সেদিনকার মত তর্ক মুলতুবী রেখে ঘুমিয়ে পড়ল। পরের দিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই ওই মালিকানা নিয়ে তিন জনের মধ্যে আবার জোর তর্ক শুরু হল। এইভাবে দিনের পর দিন তর্ক চলল ; কোন মীমাংসা হল না—আজ পর্যন্তও হয়নি ; গজদন্তের মালিকানা নিয়ে তর্ক চলেইছে।

এখন ব্যাপারটা পাঠকদের ওপরই ছেড়ে দেওয়া যাক। আপনারাই বলুন—তিন পথিকের মধ্যে গজদন্তটা ন্যায়ত কার প্রাপ্য ?

(আফ্রিকার গ্যাবন অঞ্চলের গল্প।)



20/12/89

রাষ্ট্রসঙ্ঘ-প্রকাশিত একটি অমূল্য গ্রন্থ থেকে নির্বাচিত দশটি গল্প নিয়ে ছোটদের জন্য এই আশ্চর্য বই। যদিও এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় রূপান্তরিত, তবু এমনই স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল ভঙ্গিতে গল্পগুলি বলা যে, মনেই হবে না এগুলি অনুবাদ।

লোককাহিনী শুধু অলস কল্পনার ফসল নয়, যুগ-যুগ ধরে এ-সব উপকথা লোকশিক্ষারও অন্যতম মাধ্যম। সংকলিত গল্পগুলি তাই একই সঙ্গে যেমন গল্পের ক্ষিদে মেটাবে, পাশাপাশি খুব সূক্ষ্মভাবে ছোটদের মনে ফুটিয়ে তুলবে মানুষের জন্মগত অধিকারের নানান দিক সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা।

